বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : কীর্তন

নীরু বড়ুয়া

Dhaka University Library
448766

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

মার্চ – ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নীরু বড়ুয়া কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : কীর্তন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

২৮.৩.২০১৮
ডক্টর সুমঙ্গল বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
সুপারনিউমারারী অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৮.০৩.২০১০
ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক (যুগ্ম)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ৯ – ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় : কীর্তনের উৎপত্তি ও বিকাশ ৪৩– ৫১

তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক ধারা : বৌদ্ধ কীর্তন ৫২–৭৮

চতুর্থ অধ্যায় : বৌদ্ধ কীর্তনের প্রকারভেদ ও কীর্তনীয়া ৭৯ – ৯০

পঞ্চম অধ্যায় : কীর্তনের উপকরণ পরিচয় ও পরিবেশন পদ্ধতি ৯১ – ১০২

ষষ্ঠ অধ্যায় : ছুটা কীর্তন ১০৩ –১০৭

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আমার এম. ফিল গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : কীর্তন'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আমি উপরি-উক্ত শিরোনামে এম. ফিল গবেষণার জন্য ২০০৩– ২০০৪ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধন লাভ করি। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন সুপারনিউমারী অধ্যাপক ডক্টর সুমঙ্গল বড়ুয়া আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এবং বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক। তাঁদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। জীবনের বাস্তবতায় নানারকম প্রতিকূলতা তথা বাঁধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি এ অভিসন্দর্ভ মূল্যায়ন করার জন্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার বর্তমান এ অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক রূপপরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে অধ্যাপক ডক্টর সুমঙ্গল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর সতত সুন্দর উৎসাহ প্রদান তথা অনন্য সাধারণ অনুপ্রেরণা আমি অতীব শ্রদ্ধা, বিনয় এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে সর্বদা স্মরণ করি। তাঁদের উভয়ের নির্মল, গভীর, সুচিন্তিত পরামর্শ, প্রাজ্ঞময় নির্দেশনা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের উভয়ের অপরিসীম স্নেহ-মায়া-মমতায় ধন্য ও অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ যা কখনো ভুলে যাবার নয়।

গবেষণাকালে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রথিতযশা সম্মানিত শিক্ষক ও সুধীজন তাদের প্রাজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। তাঁরা হলেন আমার বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল বড়ুয়া, ডক্টর বেলু রানী বড়ুয়া, ডক্টর সুমন কান্তি বড়ুয়া, ডক্টর দিলীপ কুমার বড়ুয়া। বাংলা বিভাগের আমার শিক্ষক ডক্টর বায়তুল্লাহ কাদেরী, জনাব হাকিম আরিফ, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিল্টন কুমার দেব, চট্টগ্রাম বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক ডক্টর জিনবোধি ভিক্ষু, বাংলা বিভাগের প্রভাষক মিল্টন বিশ্বাস, রাউজান থানার অর্ন্তগত অগ্রসার কলেজের প্রভাষক সুমেধানন্দ থের, বাঁশখালী আলাওল কলেজের প্রভাষক পলাশ মুৎসুদ্দী, বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রাবন্ধিক ও মিরসরাই কলেজের অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া, কুমিল্লা কনকস্তূপ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির আশীষ কুমার সিংহ, আমার ভাসুর শ্যামল কান্তি বড়ুয়া। সবশেষে স্মরণ করি পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য,আমার স্বামী ডক্টর বিমান চন্দ্র বড়ুয়াকে যার অনন্ত প্রোৎসাহ-সুন্দর নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম সাহায্য-সহায়তা লাভ করার জন্য তাদেরকে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

হিমালয় পর্বতমালা আর নীল বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বাকারে বিস্তৃত ভূ-ভাগটির নাম বাংলাদেশ। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও আদিবাসীর আবাসভূমি এ বাংলাদেশ। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী। এ উভয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাঙালি বৌদ্ধরা ইতিহাসের সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন হলে এ ধর্মের শেষ আশ্রয় হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মাটি এবং ইতিহাসের পাতায় এ সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এদেশে বসবাসরত বাঙালি বৌদ্ধরা এ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারী। পৃথিবীর সবদেশে প্রায় সব জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং লোকসাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে পারে। উক্তিটি বাঙালি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও সত্য। বঙ্গভূমিকে যদি বৌদ্ধভূমি বলা হয় তবে সেই বৌদ্ধভূমির ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠীর নাম বাঙালি বৌদ্ধ। এদেশের সকল বৌদ্ধ থেরবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। এ বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতির এক বিশেষ অংশের নাম হলো 'কীর্তন'। এ কীর্তন এদেশের সংস্কৃতির অনুপম সম্পদও বটে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অতীতে এদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কীর্তন নিয়ে গবেষণাকর্ম হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তন নিয়ে কোনরকম গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি-লোকসাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা সবই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মনোবৃত্তির প্রকাশ। সেই মনোবৃত্তির বর্হিপ্রকাশ ঘটে স্ব-স্ব জাতি বা সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। সেই হিসেবে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তন এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং লোকসাংস্কৃতির জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে। বাঙালি জাতি হিসেবে বহু শতাব্দীর পুরানো ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এ বাঙালি জাতিতত্ত্ব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ সকল প্রকার স্বাধিকার আন্দোলনসহ

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এ বৌদ্ধজনগোষ্ঠী। ভারতে এবং এদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের ন্যায় এ জনগোষ্ঠী কোনরকম সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে না।

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতির দেশ। বিভিন্ন প্রকার লোকগীতি এদেশের প্রাণস্বরূপ। এদেশের লোকসাংস্কৃতির অঙ্গনে বৌদ্ধ কীর্তন এক গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে কীর্তন বলতে 'সংশব্দন', 'কথন', 'গুণ বর্ণন' মহিমাপ্রচার নামগানকে বোঝায়। মূলত এ কীর্তন গান হচ্ছে মহামতি বুদ্ধের যশোসূচক কিংবা যশোকথাময় আখ্যান যা গীতিকারে পরিবেশিত হয়। সিদ্ধাচার্যের সময়ে (ষষ্ট কিংবা সপ্তম শতক) এগুলো চর্যাপদ বা চর্য্যগীতি নামে পরিচিতি ছিল।তবে ভাষা ও সুরের পার্থক্য রয়েছে। চৈতন্যদেবের সময়ে (খ্রিষ্ঠীয় ১৪৮৬-১৫৩৩) এটি পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দীর্ঘদিন কীর্তন সর্ম্পকে তেমন কোন রকম প্রভাব পড়েনি এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে বৌদ্ধদের উন্মেষ সাধিত হয়। এ সময় পুনরায় কীর্তনের প্রচলন শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে এসে কীর্তনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। এ কীর্তনের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই বুদ্ধের জীবনকথা, ধর্মপ্রচারের কথা ছাড়াও ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং তাঁর শিষ্যদের কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে লাগলো। গ্রামজীবনে এ কীর্তন তার নিজস্ব স্বকীয়তার জন্য সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যান্য কীর্তনের ন্যায় বাঙালি বৌদ্ধদের কীর্তনেও পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে। এ অঙ্গগুলো হলো যথাক্রমে ক. কথা, খ. আখর, গ. তুক, ঘ. ছুট এবং ঙ. ঝুমুর। বৌদ্ধকীর্তন নামকীর্তন, পালা কীর্তন এবং পাল্টা কীর্তন এ তিন ভাগে বিভাজিত। যিনি কীর্তন পরিবেশন করেন তাকে বলা হয় কীর্তনীয়া। অর্থ বৈভব সম্পন্ন বাঙালি বৌদ্ধ ব্যক্তিরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কীর্তনের আসর বসাতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রখ্যাত কীর্তনীয়া কীতর্ন পরিবেশন করার জন্য আসতো। তারা নিজেরা সুরের মাধ্যমে কণ্ঠের মাধুর্য্য তথা গায়কী কৌশলতা বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কীর্তন পরিবেশন করতেন।

এ কীর্তনের আসরকে শুধু ধর্মীয়সংগীতের আসর বললে ভুল হবে। বরং এটাকে লোকশিক্ষা, লোকঐতিহ্য, লোককথা ও লোকসাংস্কৃতির আসর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।কীর্তনের পরিব্যাপ্ত সমাজ জনজীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সর্বত্রে। কেবল ধর্মীয় আচরণ বলে এটাকে সীমিত রাখলে যেমন কীর্তনকে সংকীর্ণার্থে ব্যবহার করা হয় তেমনি আবার কেবল গানের ধারা বললে কীর্তনকে প্রকৃত পরিচয় দেয়া যায় না। কীর্তন হলো বাঙালির উদার মন এবং মানসিকতার পরিচয় বহনকারী উন্নতমানের সংগীত। যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ কীর্তন লোকসংস্কৃতির এক অনবদ্য লোকসাংস্কৃতির উপাদান। সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে গ্রাম সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। তারপরও গ্রামের উৎসাহীজন এবং খেটে খাওয়া সাধারণ লোকজন ধর্মীয় এবং লোকসংস্কৃতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কীর্তনের মাধ্যমে অবিদিত বিষয় জ্ঞাত হয়ে নিজেদের জ্ঞানকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে। কীর্তন পরিবেশন কালে কীর্তনীয়ার গায়কী বৈশিষ্ট্য, পান্ডিত্য, কবিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বা ও প্রতিভা থাকা অত্যাবশকীয়। এগুলোই মূলত কীর্তন পরিবেশনের সময় আখরে প্রকাশ পায়। সচরাচর অন্যান্য সংগীতে এগুলোর উপস্থিতি কিংবা তার প্রায়োগিক ব্যবহার একবারে নেই বললেও চলে। তাই বলা যায়, এ কীর্তন লোকসাংস্কৃতির জগতে এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

কীর্তন নিয়ে অতীতে বাঙালি জনগোষ্ঠীতে কোনরকম গবেষণা হয়নি। আমি তাদের অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করার লক্ষে 'বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : কীর্তন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্রতী হয়েছি। বক্ষমান এ অভিসন্দর্ভে উপসংহার ব্যতীত মোট ছয়টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলো হলো যথাক্রমে : প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি বৌদ্ধজনগোষ্ঠী ; দ্বিতীয় অধ্যায় : কীর্তনের উৎপত্তি- বিকাশ ; তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক ধারা : কীর্তন ; চতুর্থ অধ্যায় : বৌদ্ধ কীর্তনের প্রকারভেদ ও কীর্তনীয়া ; পঞ্চম অধ্যায় : কীর্তনের উপকরণ পরিচয় ও পরিবেশন পদ্ধতি ; এবং ষষ্ঠ অধ্যায় : ছুটা কীর্তন। প্রতিটি অধ্যায় তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। প্রাসঙ্গিক সব বিষয় এখানে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে রয়েছে পুরো আলোচনা সারাৎসার 'উপসংহার' নামক অংশ। অভিসন্দর্ভ রচনায় যে সব মূল্যবান গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে তা গ্রন্থপঞ্জি অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী

বৌদ্ধধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম । খ্রি. পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহামতি বুদ্ধের আর্বিভাব। সে সময় তাঁর ধর্মমত প্রচারের অন্যতম স্থান ছিল বিহার বা মগধ। মৌর্যযুগে সম্রাট অশোকের রাজ্য বিস্তৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাই বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নামক কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এই সময় বাংলাদেশ গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্র, সুহ্ম বা রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গাল, সমতট এবং হরিকেল হিসেবে পরিচিত ছিল। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বের পর খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক হতেই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদই বাংলাদেশের সমার্থক হয়ে উঠে। তবে ধারণ করা হয়, বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের অবসানে মুসলমান যুগেই বঙ্গ বা বঙ্গাল থেকে বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি। তারপর ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলো। এক ভাগের নাম হলো 'পাকিস্তান' এবং পর ভাগের নাম 'ভারত' রয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভূমিও দ্বিখণ্ডিত হয়। এক ভাগের নাম দেওয়া হলো 'পশ্চিমবঙ্গ' আর অপর ভাগের নাম দেওয়া হলো 'পূর্ব পাকিস্তান' (বর্তমান বাংলাদেশ)। ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৭১ খ্রী. পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মূল উৎসের অধিকারী ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। এই অবিবেচক শাসকগোষ্ঠীর দমন পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের অগণিত মুক্তিলাভী জনগণ, মুক্তিসেনা এবং মিত্রবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর মানচিত্রে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর এ স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এভাবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় এবং শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনভাবে পথ চলা ।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমতই হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। তিনি পয়তাল্লিশ বছর ধরে জীব-মানবের কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করতে আসাও অস্বাভাবিক নয়। আমরা প্রাচীন ভারতের ষোলটি জনপদ সর্ম্পকে আমরা ধারণা পাই। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ বা রাজ্যগুলো হলো যথাক্রমে কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদী, বংস, কুরু, পঞ্চাল, সূরসেন, মৎস, অস্মক, অবন্তী, গান্ধারও কম্বোজ। মূলত এ স্থানগুলোই ছিল বুদ্ধের বিচরণ ভূমি। এখানে কিন্তু কোথাও বঙ্গের নাম নেই। তাছাড়া বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁর (বুদ্ধের) পবিত্র দেহধাতু আট রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। এখানেও কিন্তু বঙ্গের নাম পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে মগধ এবং বঙ্গ একই রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার অধীনে ছিল। প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের সীমারেখা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী নদী ,উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। সুতরাং বলা যায়, বঙ্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অববাহিত একটি জনপদ ছিল। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ; বুদ্ধের ধর্ম যে সমস্ত স্থানকে কেন্দ্র করে প্রচারিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা তার সন্নিকটে[২]। এমতাবস্থায় বুদ্ধের জীবদ্দশায় বাংলাদেশে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এমনটি ধারণা করা যায়।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। এ সময় বাংলাদেশেও এ ধর্ম পুর্নপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। পালযুগকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে সুবর্ণ যুগ বলা হয়। এ সময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের স্রোতস্বিনী ধারায় সমধিক উন্নতি লাভ করে। শুধু বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নয় ; বাংলা তথা বাঙালি জাতির ইতিহাসে পালরাজাদের রাজত্বকালকে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগও বলা যায়। সম্রাট অশোকের পরেই পালরাজাদের অবদান চিরস্মরণীয়। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও এ পালযুগের গুরুত্ব শুধুঅনস্বীকার্য নয় অতুলনীয়ও বটে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আর. সি. মজুমদার বলেন ; অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল সেই দেশ সহসা প্রচন্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আর্যবর্তে প্রভূত বিস্তার করিবে, ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতোই অদ্ভূত মনে হয়। এ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যুদয়েই এই জাতীয় বাঙালির জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করিয়াছিল। পালরাজাগণের চারিশত বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্য বাঙালির জীবন প্রভাত[৩]।

গোপাল রাজা হিসেবে নির্বাচিত হবার আগে এক অরাজকতা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় পারস্পরিক অনৈক্য, অসমঝোতা এবং আত্মকলহ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপর ছিল। লামা তারানাথ এ অবস্থা সর্ম্পকে বলতে গিয়ে বলেন ; প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য পার্শ্ববর্তী নিজ নিজ এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। কিন্তু সমগ্রদেশের কোন রাজা ছিলেন না[৪]। বাংলার এ রকম ইতিহাসকে মাৎসন্যায়[৫] বলা হয়। এ চরম অধঃপতন কিংবা চরম দুর্দশা এবং দুর্বিপাক থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাংলার জনগণ গোপালকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান। ধর্মপাল দেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে[৬] উক্ত হয়েছে ;

মাৎসনায় মহোপিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষণাঃ করং গ্রাহিতং
শ্রীগোপাল ইতি-ক্ষিতীশ -শরসাং চুড়ামণিস্তৎসুত।
যস্যাদ্ধক্রিয়তে সনাতন যশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিন্মা যদি পৌর্ণ মাসর জনী জ্যোৎস্নতিভার শ্রিয়া।

অর্থাৎ মাৎসনায় দূর করার লক্ষে প্রকৃতিপুঞ্জ যাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করেছিল, পূর্ণিমা রজনী জোৎস্না রাশির অতিমাত্রা সাদা যার স্থায়ী যশ-গৌরবরাশির অনুসরণ করতে পারে নরপাল কূলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা ব্যপট হতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

গোপালের নির্বাচন বাংলা তথা ভারতের ইতহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি দেশের চরম দুর্দিনে ঐক্য,স্বার্থ ত্যাগ ও যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা চিরদিন বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এ পাল পর্বের বিস্তৃতির কথা বলতে গিয়ে মণিকুন্তলা হালদার দে বলেন; পালপর্বে কেবল মাত্র বাংলাদেশই নয়, সমগ্র পূর্বভারতে অভূতপূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। ভারতের বাইরে আর্ন্তজাতিক অঙ্গন তথা বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল[৭]। পালযুগ উন্নয়নের মূলে রয়েছে পালদের ঐকান্তিক এষণা, আগ্রহ এবং অনুবদ্ধ উৎসাহ ও প্রেরণার প্রর্বতন। অগ্নি কোণের কোন সাগরপুরী

Dhaka University Institutional Repository

হতে পালগণ সোনারকাঠি আহরণ করে এনেছিল জানি না, কিন্তু তার সম্মোহন স্পর্শে একটা জাতি সহসা এত কর্মনিষ্ঠ হয়ে উঠল– বিদ্যায়, ধর্মে, আচরণে, চিন্তায়, একৈক ব্যাপারে এত দ্রুত সমুৎক্রম হল সে জাতির,–যেন মনে হল গুপ্তযুগকে পালযুগ খ্যাতিতে উপর্সজন করেই যায়[৮]। শুধু কি তাই ? না। পাল বংশের সময়ে শিক্ষা-সাহিত্যে, ধর্মে-দর্শনে, শিল্প-ভাস্কর্যে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। পালরাজ বংশের অবসানে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি হয়। নিচে পালরাজাদের সময়কাল তুলে ধরা হলো[৯]।

রাজার নাম	সিংহাসনে আরোহণের কাল(আনু)	রাজত্ব কাল(আনু)
প্রথম গোপাল	৭৫০	২০ বৎসর
ধর্মপাল	৭৭৫ – ৮১০	৩৫ বৎসর
দেবপাল	৮১০ – ৮৪৭	৩৭ বৎসর
১ম সূরপাল	৮৪৭ – ৮৬০	১২ বৎসর
১ম বিগ্রহপাল	৮৬০ – ৮৬১	১ বৎসর
নারায়ণ পাল	৮৬১ – ৯১৭	৫৫ বৎসর
রাজ্যপাল	৯১৭ – ৯৫২	৩৫ বৎসর
২য় গোপাল	৯৫২ – ৯৭২	২০ বৎসর
১ম মহীপাল	৯৭২ – ৯৭৭	৫ বৎসর
২য় বিগ্রহ পাল	৯৭৭ – ১০২৭	৫০ বৎসর
নয়পাল	১০২৭ – ১০৪৩	১৫ বৎসর
৩য় বিগ্রহ পাল	১০৪৩ – ১০৭০	২৬ বৎসর
২য় মহীপাল	১০৭০ – ১০৭১	১ বৎসর
২য় সূরপাল	১০৭১ – ১০৭২	২ বৎসর
রামপাল	১০৭২ – ১১২৬	৫৩ বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

কুমারপাল	১১২৬ – ১১২৮	২ বৎসর
৩য় গোবিন্দ পাল	১১২৮ –১১৪৩	১৫ বৎসর
মদন পাল	১১৪৩ –১১৬১	১৮ বৎসর
গোবিন্দ পাল	১১৬১ – ১১৬৫	৪ বৎসর

পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং সমসাময়িককালে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশ[১০] স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। বাংলার অন্যান্য বৌদ্ধ শাসকদের মধ্যে চন্দ্রবংশের নাম পাওয়া যায়। এ বংশের প্রথমপুরুষ হলেন চন্দ্রসূর্য[১১]। প্রায় সকলেই জানেন, বাংলার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সদৃশ মহাপণ্ডিতও দার্শনিকের নাম হচ্ছে বাংলার অহংকার গৌরব জ্ঞানরশ্মি আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্ভবত বাংলাদেশীয় চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন[১২]। চন্দ্রবংশের দ্বিতীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্র থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তারা সবাই বংশানুক্রমে রাজত্ব করেন। যথা : রাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্র (৯০০–৯২০) খ্রি., শ্রীচন্দ্র (৯২৫–৯৭৫ খ্রি.), কল্যাণ চন্দ্র (৯৭৫–১০০০খ্রি.), লড়হ চন্দ্র (১০০০-১০১৫ খ্রি.), এবং গোবিন্দ চন্দ্র[১৩]। এ রাজ বংশের দেড়শত শাসনামলে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠত হয় ।

পালবংশীয় রাজাদের বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উন্নতি সাধন করে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাইতো এই যুগকে সুবর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। দীর্ঘদিন পালরাজ্য শাসন করার পর খ্রি. দ্বাদশ শতকের ষাটের দশকে পালরাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়[১৪]।

বর্তমানে এদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন : সমতলে বাঙালি বৌদ্ধ এবং আদিবাসী বৌদ্ধ। তারা উভয়েই থেরবাদী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণায়, নিয়ম-নীতিতে বিশ্বাসী। মূলপিটকীয় বিশ্বাসই তাদের একমাত্র বিশ্বাস এবং ধর্মীয় অবলম্বন। সমতলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বাঙালি বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ বাঙালি বৌদ্ধদের আচার-আচারণ, কথাবার্তায়, ধর্মীয়ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরাকানী প্রভাব বিদ্যমান। বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হচ্ছে সমগ্র বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। মহামতি বুদ্ধের বিচরণক্ষেত্র, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্ম প্রচারের স্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় তিমিত বাংলায় তখন বৌদ্ধধর্মের বিদ্যমানতা যেন রূপকথার ন্যায় মনে হয়। এ রূপকথার গল্পকে বাস্তবে রূপদান করে এসেছে বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ এবং গবেষক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেছেন। এখানে বাঙালি বৌদ্ধ বলতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা অঞ্চলে বসবাসরত বৌদ্ধদেরকে বোঝায়। এ সর্ম্পকে তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর তেমন কোনরকম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাই স্বাভাবিক কারণে আমাদেরকে জনশ্রুতি এবং প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে বসবাসরত সকল বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মগধাগত বলে সবাই জানে। এটা বাঙালি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত একটি প্রবাদ। এ সর্ম্পকে পণ্ডিত এবং অনুসন্ধিৎসু সুধীজনদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা দরকার বলে আমি মনে করি। 'চট্টগ্রামে ইতিহাস-পুরাণা আমল' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় মাহবুব উল আলম মনে করেন ; ভারতে বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে তিষ্ঠিয়া থাকা অসম্ভব হলে বৃজি বা বৃজিপুত্র উপজাতি এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সাতশত অনুচরসহ মগধ হতে পলায়ন করার পথে চট্টগ্রাম এবং আধুনিক নোয়াখালীতে এসে উপস্থিত হন[১৫]। আবার এ বিষয়ে নূতন চন্দ্র বড়ুয়া অভিমত প্রকাশ করেন এভাবে ; দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধদের উপর মর্মান্তিক নির্যাতন ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমূলে ধ্বংস করার ফলে সেখানে বৌদ্ধদের নিরাপত্তা নেই মনে করে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। কিছু সংখ্যক আবার তিব্বতে চলে গেল। আবার বৈশালীর বৃজিবংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহু সংখ্যক অনুচরসহ মগধ সাম্রাজ্য হতে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে পর্বার পথে আসাম হয়ে নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকে[১৬]। আবার 'বৃহৎবঙ্গ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মগধের লোকেরা উর্পযুপরি শত্রুর আক্রমণে মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়ে বৌদ্ধরা নেপাল, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেছিলেন[১৭]। নীরু কুমার চাকমাও বলেন – মুসলমান আক্রমনের ফলে বিহার ও বাংলায় বিভিন্ন বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান যখন বিধস্ত হয় এবং এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়, তখন অনেক বৌদ্ধ নেপাল, তিব্বত, ভূটান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী দেশে যেমন পালিয়ে যায় তেমনি আবার সোজা চট্টগ্রাম অথবা আসামে এবং আসামে থেকে পরে কুমিল্লায় চলে আসন[১৮]। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন ; তারা নিজেদেরকে মগধ বিতাড়িত ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। মগধ বিতাড়িত হয়ে চট্টগ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে[১৯]। এ বিষয়ে বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং গবেষক ধর্মাধার মহাস্থবির বলেন ; ত্রয়োদশ শতকে মোগলদের আক্রমনে মগধ হতে অনেকে চট্টগ্রাম এসে বসবাস শুরু করেছে[২০]। আবার সুকোমল চৌধুরী বলেন ; আরাকানের মধ্য দিয়ে মগধ থেকে এসেছে[২১]।

বাস্তবিকপক্ষে উপরি-উক্ত প্রায় সব বক্তব্য একই রকমের। এখানে সকলেই একমত যে, তারা সবাই নির্যাতনের সময় ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছেন। তবে তারা এদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে না গিয়ে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। এখানেও স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন জাগে। আবেগ দিয়ে কখনো ইতিহাস রচিত হয় না। তাতে স্বচ্ছ বিক্ষিপ্ত সর্বোপরি অসত্য বিভ্রান্তময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে না। এমতাবস্থায় বহুলাংশে বির্তকও সৃষ্টি হয় এবং ইতিহাস নির্ণয়ে জটিলতা বাড়ায় বারবার দেখা দেয় সামাজিক সংকট। বাংলাদশে বসবাসরত বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমন, বসতি স্থাপনের সঠিক ইতিহাস কোথাও নেই ; নেই কোথাও কোন রকম তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর দলিল এবং প্রমাণাদি। তবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং নোয়াখালী আরাকানের খুবই নিকটবর্তী অঞ্চল। খ্রিষ্টীয় ১০ম শতক থেকে ১৬৬৬ খ্রি.পর্যন্ত মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে থাকলেও চট্টগ্রামের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আরাকানের রাজ্যভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৬৬৬ খ্রি. এবং শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীর থেকে ১৭৫৬ খ্রি.পর্যন্ত চট্টগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকানের শাসনাধীন ছিল। সমতটের দেববংশীয় রাজা দানোদর দেব ১৩০০ শতকে অল্পকালের জন্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করে শাসন পরিচালনা করেন। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে আরাকান রাজ অলংপিউ চট্টগ্রামসহ বঙ্গদেশের কিছু অংশ জয় করেন। এ শতকের শেষার্ধে আরাকান রাজ মেংদি তাঁর রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মপুত্র তীর অবধি বিস্তার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে তাতারের খান অল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম পুনরায় আরাকান রাজ্যভুক্ত হয়[২২]। বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গরাজ্যের প্রতিবেশী দেশ বলে অভিহিত করা হয়[২৩]। সুতরাং এ সময়ের মধ্যে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার নিপীড়ন করলে তারা প্রাণ রক্ষার্থে স্বধর্মীদের নিকট আশ্রয় নেয়। তাই প্রাসঙ্গিক কারণে বলা যায়, মগধে অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারে ধর্মীয় সম্প্রীতির অসদ্ভাব দেখা দিলে আরাকানের শাসনাধীন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করা খুবই স্বাভাবিক। এখানে মগধাগত বৌদ্ধ এবং আরাকানী বৌদ্ধ কিন্তু এক হয়ে গেল। তবে সুকোমল চৌধুরীর মন্তব্যটি পুরো ইতিহাসকে ভিন্নখ্যাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। কেননা আরাকানের উপর দিয়ে মগধ থেকে এদেশে আসার উপায় তখনও ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। সুতরাং আরাকানের মধ্য দিয়ে মগধ থেকে বৌদ্ধরা আসা অযৌক্তিক। বরং মগধ থেকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বৌদ্ধরা আরাকানে যাওয়াও খুব বেশি যৌক্তিক বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর আদিবাসী বৌদ্ধরা সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওঁগা, ঠাকুরগাঁও এবং তিন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। বাঙালি বৌদ্ধরা বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং নোয়াখালীর কিছু কিছু অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের উভয়ের স্বতন্ত্র কিংবা আলাদা আলাদা ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-আচারণ ও অনুষ্ঠান রয়েছে। বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হলেও দেশ তথা বর্হিবিশ্বে তারা বসবাস করছে আর বৃদ্ধি করছে বাংলাদেশের সুনাম। বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক উপাধি দেখা যায়। যেমন : তালুকদার, চৌধুরী, মহাজন, সিং, হাজারী, বড়ুয়া চৌধুরী, মুৎসুদ্দী, সিং বা সিংহ। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বৃহত্তর চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর তালুকদার, চৌধুরী, মহাজন, বড়ুয়া চৌধুরী, মুৎসুদ্দী আর কুমিল্লা এবং নোয়াখালী অঞ্চলের বৌদ্ধরা সিং বা সিংহ উপাধিধারী। তবে কুমিল্লা এবং নোয়াখালী অঞ্চলের বৌদ্ধদের কাউকে কাউকে এখন বড়ুয়া উপাধি ধারণ করতে দেখা যায়। সিংহ বা সিং উপাধিধারী বৌদ্ধদের আগমন সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত তাঁর ' The Singha Buddhist Community in Bangladesh' নামক পুস্তি

Dhaka University Institutional Repository

কায় বলেন ; The Barua and Chakma were the desecendent of Vaishali Rajand Shakya dynasty of Kapilavastu and they came to Chittagong due to the opperation of Ajatashatru and those who came last of all took up the title of Singha. The Buddhis of Noakali, Tripura at present Comilla also took up the title of Singha.[২৪] বিজয় সিংহ এ বঙ্গ থেকে সিংহলে গিয়ে সর্বপ্রথম সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে লংকা দ্বীপের নাম রাখা হয় সিংহল[২৫]। চট্টগ্রাম এদেশের একটি প্রাচীন নগরী। এ চট্টগ্রাম এখনো তাঁর পূর্ব ঐতিহ্যগুলো ধারণ করে আছে। আরাকানের প্রথম রাজা চন্দ্রসূর্য ১৫১ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম অভিযানে অংশগ্রহণকারী মগধাগত সৈন্যদের সংমিশ্রণে চট্টগ্রামের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসীর উদ্ভব হয়[২৬]। এদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা মূলত বড়ুয়া গোত্রীয় এবং সিংহ গোত্রীয়। প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের উপর অমানবিক নির্যাতন আরম্ভ করলে বৌদ্ধরা এদেশে চলে আসে। এ সময় এদেশে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিল। দ্বিতীয় শতকে মধ্যভাগে চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দাদের একটি অংশকে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করানো হয়। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে আভারাজ বোধপয়া (১৭৮২-১৮১৯ খ্রি.) প্রথম আরাকান রাজ্য জয় করে মায়ানমার-এর অর্ন্তগত (ব্রহ্মদেশ কিংবা বার্মা) করেন। এ সময় অসংখ্য অসংখ্য নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, নিগৃহীত আরাকানী প্রাণ বাঁচানোর জন্য বৃহত্তর চট্টগ্রামে চলে আসেন। এ সময় স্থানীয় এবং আরাকানী বৌদ্ধদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াও স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে যান্দাবুর (য়্যাণ্ডনো) চুক্তির ফলে এদেশ থেকে আরাকানে যাবার তেমন কোনরকম অসুবিধা হতো না। ফলে এদেশের বাঙালি বৌদ্ধরা আরাকানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। এ বিষয়ে দেখা যায় ; আরাকানে বেশ কিছু অধিবাসী বাস করে। তারা প্রায় সবাই বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করে। বড়ুয়া বৌদ্ধরা চেহারা ও দৈহিক গঠন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা মোঙ্গলীয় রক্তে ধারক ও বাহক সুপ্রাচীন আরাকানী বর্ণ সঙ্কর তবে অভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে আরাকানের বাঙালি বৌদ্ধরা আরাকানীদের সাথে মিশে যেতে পারেনি[২৭]। তবে এটা ঠিক যে, আরাকানী বৌদ্ধদের সাথে মিশে যেতে না পারলেও বাঙালি বৌদ্ধদের দৈহিক গঠন কিন্তু অনেকটা আরাকানীদের

Dhaka University Institutional Repository

মতো। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ; The Rajbansis and Baruas of Chittagong are also Burmese desecent but their origin is not purely Burmese. They have adopted Hindus customs and Bengali Language.[২৮]

এখানে রাজবংশী ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। উভয়ই শব্দ দু'টি বাংলা শব্দ[২৯]। রিসলে মঘদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভাজন[৩০] করে দেখিয়েছেন। যথা : ক. মারমাগ্রী, রাজবংশী বা বড়ুয়া মঘ, খ, জুমিয়া মঘ এবং রোয়াং বা রাইখাং মঘ।

ক. মারমাগ্রী, রাজবংশী বা বড়ুয়া মঘ : মগধাগত রাজা ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে স্থানীয় আরাকানী মহিলাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে আরাকানী সৈন্য-সামন্তদের সঙ্গে চট্টগ্রামের বাঙালি রমনীর রক্তের সংমিশ্রণে জাত বর্ণসঙ্কর জনগোষ্ঠী রাজবংশী বা বড়ুয়া মঘ শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত। কৈলাস চন্দ্র বড়ুয়া সিংহ বলেন : ১৫৬২ শতকে আরাকানরাজ পর্তুগীজদের সাহায্যে ত্রিপুরা জয় করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। সেখানে একজন মঘ শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। এ সময় আরাকানপতি পর্তুগীজদের তথায় সংস্থাপনপূর্বক তাদের স্বীয় রাজ্যের সীমান্তরক্ষণে নিযুক্ত করলেন। এ সময় অনেকে রমনী সংযোগে এক নতুন জাতীয় জীবের সৃষ্টি করল। পর্তুগীজ সন্তানগণ নিম্নশ্রেণীর বাঙালি সংযোগে একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করলো, তারাই দেশী মঘ বা রাজবংশী[৩১]।

খ. জুমিয়া মঘ : এ জুমিয়া মঘ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী মারমা সম্প্রদায় বা আরাকানী সম্প্রদায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে আনুমানিক চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতকে তারা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে বলে তাদের জুমিয়া মঘ বলা হয়।

গ. রোয়াং বা রাখিয়াং : রোয়াং বা রাখিয়াং মঘ হচ্ছে যারা ১৭৮৫ সালে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) কর্তৃক আরাকান অধিকৃত হলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ।

Dhaka University Institutional Repository

জুমিয়া মঘ ও রোয়াংরা আরাকানী ভাষায় কথা বলে এবং বর্মী বা আরাকানী সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা তারা প্রভাবিত। কিন্তু রাজবংশী ও বড়ুয়া মঘদের মাতৃভাষা বাংলা এবং তারা বাঙালি সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট। এ তিন ধরনের নাম ছাড়াও বাঙালি বৌদ্ধদের 'ভূইঁয়া মঘ' এবং 'মঘ কুক' নামে তাদের খ্যাতি ছিল। নিম্নবিত্ত বৌদ্ধরা কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিল। এজন্য তাদের 'ভূঁইয়া মঘ' বলা হতো। 'মঘ কুক' জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের পেশা ছিল হোটেল, রেস্তোরা, ক্লাব, ইউরোপিয়ান সাহেবদের বাড়িতে বাবুর্চিগিরি। 'মঘ কুক' নামে তাদের খ্যাতি ছিল। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন শহরে তারা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা বা দেশ বিভাগের পূর্বে তারা চট্টগ্রামের বাইরে চাকুরী করত কিন্তু অবসরান্তে স্বগ্রামে ফিরে যেত। ১৯৪৭ সালের পর তারা পশ্চিম বঙ্গে, ত্রিপুরায়, আসামে, দিল্লীতে এবং অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে মঘ কুকদের বংশধররা শিক্ষিত হয়ে চাকুরীজীবীরূপে দিন যাপন করছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যান্য মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী[৩২]। আরাকানী বৌদ্ধরা মঘ নয়। বাঙালি বৌদ্ধরাই মঘ। আরাকানীরা নিজেদেরকে 'রাখাইনচ্যা' বলে এবং তারা বড়ুয়াদের 'মারমাগ্রী' বলে সম্বোধন করেন। মারমাগ্রী শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ' বা 'শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ'। বড়ুয়া মারমাগ্রী শব্দদ্বয় একার্থবোধক। বিদেশীরা যেমন এককালে সিন্ধু নদীর এ পাড়ের ভারতীয়দের হিন্দু বলে সম্বোধন করতেন, সে রকম মুসলমানেরা আরাকানী এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধ উভয়দেরকে মঘ বলে সম্বোধিত করতেন। তারা বড়ুয়া পাড়াকে 'মঘ পাড়া; এবং চট্টগ্রামের ঠেগরপুনির বুড়া গোঁসাইয়ের মেলাকে 'মঘ খোলা' বলে থাকেন। কিন্তু আরাকানীরা মঘ নয় তারা রাখাইন। আরাকান রাজারা বহু বছর চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করেছেন বলে ধর্মীয় একাত্মতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে[৩৩]। সে সময় মগধাগত বৌদ্ধ, চট্টগ্রাম ও আরাকানের বৌদ্ধদের মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় আরাকানে ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত প্রসারও প্রচার লাভ করে[৩৪]।

বড়ুয়া এবং আরাকানীদের ইতিহাস এক এবং সম্পূর্ণরূপে অবিচ্ছেদ্য[৩৫]। বড়ুয়াদের সাথে আরাকানীদের সম্পর্কের প্রমাণস্বরূপ আরাকানের মাউক উর তেজরাম বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষিত প্রস্তর শিলালিপির চতুর্থ প্রস্তরফলকে

Dhaka University Institutional Repository

'বড়রোয়া' এবং ধর্মীয় দান শিলালিপিতে 'মন দউলা ছৌমন চ বরং রোয়াং' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে[৩৬]। উপরি-উক্ত 'বড়রোয়াং' বলতে বড়ুয়াকে বোঝানো হয়েছে। এদেশে বসবাসরত মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী বললেও ভুল হয় না কখনো। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী যে একটি সঙ্কর জাতি তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দৈহিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাঙালি বৌদ্ধরা শুরু থেকে বাঙালি জাতি সত্ত্বায় বিশ্বাসী ছিল। আরাকানী শাসনের সময়ে চট্টগ্রাম থেকে বহু বৌদ্ধ এবং হিন্দু জনসাধারণও চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরাকানে গমন করেছিল এবং এখনো পর্যন্ত বহু বাঙালি হিন্দু-বৌদ্ধ সেখানে বসবাস করছে। সেখানকার বাঙালি বৌদ্ধরা মূলত চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদেরই বংশধর।

বাঙালি বৌদ্ধরা বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বিশেষ। এখানে রাজবংশী বড়ুয়া, সিংহ সবাই বাঙালি। ঊনবিংশ শতকের পূর্বে নিজেদের গোত্র পরিচয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অনেকেই রাজবংশী পদবীর ব্যবহার করতো । কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ রাজবংশী পদবীর ব্যবহার আর হয় না এখন সচরাচর। তবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ এ ধরনের পদবী ব্যবহার করে এখনো। এদেশে বসবাসরত সকল বাঙালি বৌদ্ধ বর্ণসঙ্কর বলে আমি আগেই বলেছি। রক্ত সাঙ্কর্য্যের ফলেই এ বর্ণ সঙ্কর হয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মগধ, হিন্দু, মুসলিম, আরাকানী, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী এবং পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহমান। মগধ এবং আরাকানীদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। একসময় ছিল এ জনগোষ্ঠীকে অবহেলার চোখে দেখত মুসলিম ছেলেমেয়েরা। এ বিষয়ে একটি প্রবাদে উক্ত হয়েছে ;

মঘের জাতি কেয়ারা খাইতি
গু দেখিলে লেল্লারিতি।

অর্থাৎ মঘ জাতিরা কাঁকড়া খেতে অভ্যস্ত হলেও বিষ্ঠা দেখলে ঘৃণাবোধ জন্মাতো না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ধারণা করা হয়, বড়ুয়া এবং আরাকানীরা দীর্ঘদিন একইধর্মের অনুসারী হয়ে একসাথে পাশাপাশি বসবাস করায় 'মঘ' বড়ুয়া হয়েছে আর 'বড়ুয়া' মঘ হয়েছে এমনটি কল্পনা করা অযৌক্তিক নয় । তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় চট্টগ্রামের রাউজান থানার অর্ন্তগত ১০ নম্বর পূর্বগুজরা ইউনিয়নের 'আধার মানিক' গ্রাম। এ 'আধার মানিক' গ্রাম স্থান পেয়েছে একটি বিশেষ কাব্যিক পদে[৩৭]। পদটি যেমন :

আধার মানিক মৌজা কদম রসুল
ফাজিল সে অধিকারী মঘধবহুল

এখানে আধার মানিক নামক একটি গ্রামের অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গ্রামে এখনো পর্যন্ত অসংখ্য বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের সবাই বড়ুয়া পদবীধারী বাঙালি বৌদ্ধ এবং অধিকাংশই ফাজিল গোত্রীয় যা উপরি-উক্ত পদে দৃষ্টনীয়। সুতরাং এখানে 'মঘ' বলতে বাঙালি বৌদ্ধজনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে আরাকানীদের নয়।

বাঙালি বৌদ্ধদের পদবীর উৎস নিয়ে অল্পবিস্তর জল্পনা কল্পনা রয়েছে। এজনগোষ্ঠীর পদবী গ্রহণের সঠিক কোন তথ্য কিংবা তত্ত্ব পাওয়া যায়নি। আগেই বলেছি বাঙালি বৌদ্ধ বলতে আমরা 'বড়ুয়া' এবং 'সিংহ' পদবী ধারীদেরকে বোঝানো হয়। এখানে বড়ুয়া এবং সিংহ পদবীর আদি উৎস হিসেবে কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়। বড়ুয়া সর্ম্পকে অভিমতগুলো তুলে ধরা হলো

ক. বড়েয়া > বড়োআ > বড়ুয়া[৩৮]
খ. বড়রোয়া > বড়ুয়া[৩৯]
গ. বড়অরিয় > বউড়গ্যা > বড়ুয়া[৪০]
ঘ. বেড়ুয়া > বড়ুয়া[৪১]

উপরি-উক্ত মন্তব্যগুলো অপভ্রংশ শব্দের মধ্য দিয়ে বড়ুয়ায় রূপান্তরিত হয়। এখানে বড়ুয়া পদটি মহান, শ্রেষ্ঠ , বড় এবং সম্মানিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সর্বপ্রথম আসামেই এ বড়ুয়া পদটির আক্ষরিক প্রয়োগ দেখা যায়। অহোম রাজাদের কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে যে সব প্রশাসনিক পদের সৃষ্টি করা হয় তন্মধ্যে বড়ুয়া পদটি খুবই

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ। বড় থেকে বড়ুয়া পদের সৃষ্টি[৪২]। এ বড়ুয়া ছিল হাজারীর উপরিস্থ পদের অন্যতম। এ বিষয়ে Dr S. L Baruah বলেন ; An officer of Ahom government being the head of a department or khel or mel which had no phukan or the deputy of a department which was presided by over by a Phukan.[৪৩] শুধু তাই নয়, এ বড়ুয়া উপাধিধারীরা আবার নিজেদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূণ পদে নিয়োজিত করে কর্ম সম্পাদনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ রকম আভাস পাওয়া যায় 'Assam in the Ahom Age' নামক গ্রন্থে। এখানে দেখা যায় ; The Baruas used to be appointed in consideration of merit. The Majority of the Baruas were connected with the department of supply. A new how ever had local administrative duties. The Barua had control over the Paiks[৪৪]. তাছাড়া এ বড়ুয়া উপাধিধারী আসাম সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক গোপনীয় শাখা ন্যায় ও সাহসের খ্রি.সাথে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ সম্পর্কিত 'History of Asam' এ একটি ধারণা পাওয়া যায় 'Next into the Phukans were the Baruas of whom the were twenty or more including the Bhandari or treasure; the Duliya Barua who had charge of the king planguins; the Chandangiya Barua who had supurinted executions ; the Thanikar Barua or chief or artificer; the Sonador Barua, or mint master and chief Jeweller ; The Beji Barua phyician to the royal family ; the Hati Barua, Ghora Barua and others[৪৫]. এ সময় বড়ুয়া পদবীধারীকে প্রধান উপাদেষ্টা হিসেবেও নিয়োগ করা হয়েছিল[৪৬]। পঞ্চদশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদে বড়ুয়া পদের প্রয়োগ রয়েছে। পদটি নিম্নরূপ ;

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ[৪৭]।

Dhaka University Institutional Repository

ধনমানিক্য ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ (১৪৯০-১৫২০ খ্রি.)। তিনি প্রজ্ঞাদীপ্তময় একজন সুদক্ষপ্রশাসক ছিলেন। তিনি তার রাজত্বকালে সেনাবাহিনীতে বড়ুয়া উপাধি দিয়ে একটি পদ সৃষ্টি করেছিলেন। এ পদলাভী সবাই ছিল অতি চালাক, সুচতুর, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি সুসংহত। এ সর্ম্পকে 'রাজমালা' নামক গ্রন্থে[৪৮] দেখা যায় ;

শ্রীধনমানিক্য রাজা তদাবধিসেনা
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা ।

এতে ধারণা করা হয়, ধনমানিক্য বড়ুয়া পদবীধারীদেরকে অতি উচ্চে স্থান করে দিয়েছে। ধনমানিক্য'র সন্তান অমরমানিক্য (১৫৯৭-১৬৬১১) প্রথমে এ বড়ুয়া পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পিতার মৃত্যু হলে (১৬১১) অমরমানিক্য রাজ্য ও রাজত্ব লাভ করে। তাঁর রাজা হওয়া সর্ম্পকে উল্লেখ রয়েছে এভাবে[৪৯] ;

বিজয় মানিক্য রাজার জমিদার আমি
সে রাজার বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।

এদেশে বসবাসরত আদিবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠী অন্যতম। পাবর্ত্য জেলায় বড়ুয়ার পুত্র ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে চাকমাদের রাজা হয়ে রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাত্তুয়া বড়ুয়ার বংশধরাই চাকমা সমাজে বড়ুয়া গোজার সৃষ্টি করেন[৫০]। বড়ুয়াদের কার্যক্রম, আচার-আচরণ করতো বলেই তাদের আখ্যা বড়ুয়া গোজা হয়েছে[৫১]।

নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ বসবাস করে। তাদের পদবী সিং বা সিংহ। তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রাচীন বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। 'সিংহ' শব্দের অর্থ মহৎ বা শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধর্মের প্রর্বতক মহামতি বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর অনুসারীরা সিংহ পদবী ব্যবহার করতো । বর্তমান মায়ানমার (বার্মা বা ব্রহ্মদেশ) এবং শ্রীলংকার (সিংহল) মধ্যে অনেকেই এ সিংহ পদবী ব্যবহার করেন। মায়ানমারের সিংহরাজ, শ্রীলংকায় সিংহবাহু ও শ্রীরাজ সিংহ এবং বাংলাদেশের বিজয় সিংহ খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন[৫২]। তাছাড়া ৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে সোল সিংহ (Sola Singha) এবং ৯৯৪/৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কাই সিংহ (Ky

Dhaka University Institutional Repository

Singha) নামে বারাণসীতে রাজা ছিলেন[৩৩]। এমনকি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখনো অনেক লোকজন নিজেদের পদবী হিসেবে সিং বা সিংহ ব্যবহার করে। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতক থেকে এ জেলায় খড়্গ, দেব, ও চন্দ্র প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। পশ্চিম ভারত থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধ ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে কুমিল্লা জেলায় এসে বসবাস আরম্ভ করে[৩৪]। বাস্তবিকপক্ষে সিংহ জনগোষ্ঠীও মগধাগত। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপর অত্যাচার-নির্যাতন এবং নিপীড়ন শুরু হলে বৌদ্ধরা এদেশে পালিয়ে আসে। এমতাবস্থায় কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ নোয়াখালী এবং কুমিল্লা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মূলত বড়ুয়া এবং সিংহ প্রায় সমার্থক শব্দ। উভয় শব্দ দ্বারা 'মহান', 'বড়', কিংবা 'শ্রেষ্ঠত্বকে' বোঝায়। বাঙালি বৌদ্ধদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একসময় আরাকানী নাম ও প্রচুর পদের ব্যবহার যেমন দেখা যায়, তেমনি আবার হিন্দু ধর্মের নাম ও অন্যান্য পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। গোষ্ঠী'র ক্ষেত্রে আরকানী নাম। যথা : কপিতাং গোষ্ঠী, ছিদাং গোষ্ঠী, হাহুংগ্রী গোষ্ঠী, ফুঙ্গি গোষ্ঠী , লেবাইং গোষ্ঠী ইত্যাদি। নাম-এর ক্ষেত্রে আরকানী নাম। যথা : চরপ্রু বড়ুয়া, মংপ্রু বড়ুয়া, চাইলাপ্রু বড়ুয়া, ছাতাপ্রু বড়ুয়া, মহাপ্রু বড়ুয়া, অঙচান মহাস্থবির, কঙলা মহাস্থবির, লোহান মহাস্থবির , অঙলা মহাস্থবির, চাইন্দ্যা মহাস্থবির। দৈনন্দিন ব্যবহৃত কিছু পদাবলী। যেমন : মইশাং (বৌদ্ধ শ্রামণ), ক্যং বা কেয়াং (বৌদ্ধ বিহার), লোথক (ভিক্ষুত্ব ত্যাগী ব্যক্তি), ছোয়াইং (বুদ্ধ ও ভিক্ষু- শ্রামণদের প্রদত্ত আহার), কারেঙ্গা (ভিক্ষুর সেবক), থাগা (উপাসক-উপাসিকা), ফারিক (সূত্র), ফাং (বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণদের নিমন্ত্রণ), ছাদাং (পূর্ণিমা), আনক্কা (পশ্চিম), আলং(চৌকি) , ফরা (বুদ্ধ), তরা (ধর্ম, সাংঘা (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ইত্যাদি। কিছু কিছু হিন্দু প্রভাবিত নাম হলো : কালীপদ বড়ুয়া, সীতারাম বড়ুয়া, বলরাম বড়ুয়া, লক্ষণ বড়ুয়া, দুর্গারানী বড়ুয়া, সরস্বতী বড়ুয়া, শ্যামা বড়ুয়া, কালীকিংকর বড়ুয়া ইত্যাদি। অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় প্রচলিত শব্দ যেমন : গোঁয়াই (বুদ্ধ), মন্দির (বৌদ্ধ বিহার), ঠাকুর (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে এ বাঙালি বৌদ্ধরা আরাকানী এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাস করে এসেছিল। এমতাবস্থায় কিছু কিছু পদ বা শব্দ তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রবেশ করা অযৌক্তিক নয় বরং যুক্তিযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি বৌদ্ধদেরকে নিয়ে নানারকম উপাখ্যান রয়েছে, রয়েছে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান যেমন নিজেদেরকে আরব থেকে আগত বলে মনে করে আবার তেমনি হিন্দুরা যেমন নিজেদেরকে আর্য বলতে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ করে। অনুরূপভাবে এদেশের বৌদ্ধরা নিজেদেরকে মগধাগত বলে দাবী করে। বাস্তবিকপক্ষে এ জনগোষ্ঠী মগধাগত হলেও পরবর্তীকালে রক্তসাঙ্কর্যের প্রভাব পড়েছে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। রক্তসাঙ্কর্য হলেও এ জনগোষ্ঠী বৃহত্তর অধিবাসীর সাথে একাকার হয়ে যায়নি। নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই সত্যতা প্রতিপাদন করে : সমতলে বসবাসকারী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বৃহত্তর জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার বছর ব্যাপী বির্বতনে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘঠেছে, বাঙালি বৌদ্ধরা সে-ই জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। ধর্মগত ভিন্নতা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বাদ দিলে জীবনাচরণে ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে তারা বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর সঙ্গে একই বাঙালি জাতীয়তা সূত্রে গ্রথিত[৫৫]।

উত্থান পতন জগতের অপরিহার্য ধর্ম। যে বৌদ্ধধর্ম একদিন ভারতবর্ষের সর্বত্রে প্রচারিত হয়ে কালে পুরো পৃথিবীতে প্রচার-প্রসার হয়েছিল সেই ধর্ম নিজের জন্মভূমিতে নিস্প্রভ প্রদীপের ন্যায় কালে তিরোহিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে এ ধর্ম বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে এসে শেষ আশ্রয় খুঁজে পায় নতুনভাবে। এ সময় তারা নিরাপদে এবং স্বস্তিতে বসবাস করতে থাকে এদেশে। দীর্ঘদিন তারা একই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিল। এ সময়কালে তারা বংশ পরম্পরায় মিশ্রসংস্কৃতি বিশ্বাস ও পরিপালন করে এসেছিল। তাই সঙ্গতকারণে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীতে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বিরাজমান ছিল। সুদূর অতীতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা অঞ্চল আরাকান রাজাদের শাসনে ছিল। এ সময় মগধে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং নিপীড়ন শুরু হলে এতদঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে বসবাস করা স্বাভাবিক। অনেকেই আবার চট্টগ্রামের উপর দিয়ে আরকানেও চলে যায়। কিছুসংখ্যক আবার নেপাল, ভূটান এবং তিব্বতেও আশ্রয় লাভ করে। এদেশে বসবাসকারী বাঙালি বৌদ্ধরা সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণপদে আসীন হয়ে ন্যায়, নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা বিভিন্ন নৃ'গোষ্ঠীতে বিভক্ত । যেমন : চাকমা, মারমা, তনচঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, রাখাইন, সিংহ ও বড়ুয়া এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ। তারা আঞ্চলিক কিংবা বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে এবং বিশ্বাস করে নানারকম সংস্কার-সংস্কৃতি। বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী আচার-আচরণে, লোকজ এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এদেশের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নাম বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। এ জনগোষ্ঠীর সবাই প্রাচীন থেরবাদী বৌদ্ধ আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের বেশির ভাগ বাঙালি বৌদ্ধ বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলায় এবং কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলায় বসবাস করে। বাংলাদেশের মোট ১৩০.৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার ০.৭% জন বৌদ্ধ এদেশে বসবাস করে[১৬]। এ রিপোর্টে ১৯০৩ থেকে ১৯৪১ খ্রি. এদেশে মোট জনসংখ্যার কতজন বৌদ্ধ বসবাস করতো তার কোরকম তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পরিসংখ্যানে ১৯৫১ খ্রি. থেকে বৌদ্ধদের শতকরা হার পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠর উল্লেখ করা হলেও তাতে মোট কতজন বাঙালি বৌদ্ধ তার কোন হিসেব নেই। সুতরাং বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সর্ম্পকিত বিস্তৃত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত সারণিগুলো দেখা যেতে পারে।

সারণি–১

থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রাউজান	৩২০	২২০০
জামুয়াইন	৪০	২৫০
হিঙ্গলা	৬৩	৫২০
কদলপুর	১২০	৭৪০
পাহাড়তলী	৫৮০	৩৯৪০
সুরঙ্গা	৪০	২৭৫
পূর্ব আধার মানিক	১৪০	১০৫০
মধ্য আধার মানিক	১৬০	১০৭০
পশ্চিম আধার মানিক	২১০	১৪০০

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর গুজরা	১১০	৬৮০
কদলপুর	২০	১২৭
পূর্ব বিনাজুরী	৬৫	৪৪৫
মধ্যম বিনাজুরী	১৩০	৮৫০
পশ্চিম বিনাজুরী	২৬০	২০০০
পূর্ব ইদিলপুর	১৩০	৯৫০
ইদিলপুর	৪০	২৯০
মধ্যম ইদিলপুর	৫০	৩৬০
খৈয়াখালী	৮৫	৭৪০
হোয়ারাপাড়া	৪৩০	৩৪২৫
ছদাংগরখীল	৭০	৪৮০
পূর্বগুজরা	৩৫	২৪০
হলুদিয়া	৭০	৫১০
অদাবুর খীল	১১০	৭৫০
উত্তর ঢাকাখালী	১২০	৮৩৫
দক্ষিণ ঢাকাখালী	১৬৫	১১২৫
ডোম খালী	৬৫	৫২৫
পশ্চিম আবুরখীল	১৩৫	১০২০
পাঁচখাইন	৮০	৫৮০
বাগোয়ান	৫০	৪৩০
নোয়াপাড়া বৈদ্যপাড়া	১২০	৭৫০
ফতেনগর	৫০	৩৫০
লাঠিছড়ি	১০০	৭০০
উত্তর জয়নগর	৬০	৪২৫
দক্ষিণ জয়নগর	৫০	৩৮০
গাহিরা	৭০	৫০০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২

থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
সৈয়দবাড়ি	১২০	৭৮০
ইছামতি	১৭০	১২৫০
ঘাটচেক	১২৫	১০৭০
কুলকুরমাই	২০০	১৩৭০
নগরের টিলা	১৫০	১০৪০
শিলক	২৭০	১৬০০
পাইন্যালির কুল	৭০	৪৫০
রাজানগর	১৫০	৯৮০
ত্রিপুরা সুন্দরী	৪০	২৭৫
পোমরা	৫৫	৪২০
বেতাগী	২১০	১৪৮০
ফিরিঙ্গীর খিল	৩২৫	২১৫০
পদুয়া	৪০০	২৮৭০
সুখবিলাস	২৫০	১৭৪০
হরিহর	২০০	১৪৮০
ধামাইর	১৫০	১০১০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৩

থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
সুন্দরপুর	২০	১২৫
ভূজপুর	৬৫	৪৭০
আমতলী	১০	৮০
হাইদচাকিয়া	২৫০	১৭৫০
জানারখিল (চিলোনিয়া)	৬০	৩৯০
সুন্দরপুর (চেউঙ্গার পাড়)	২৫	১৬৫
নানুপুর	২৭৫	১৮৮০
কোঠেরপাড় (জাহানপুর)	১০০	৭২৫

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিন্তাপুর	২৫	১৫৫
হারুয়ালছড়ি	৫০	৩৪০
আবদুল্লাহপুর	৩০০	২১০০
ধর্মপুর	৪০	২৮৫
চন্দ্রাখীল	৭৫	৫১০
ফরাঙ্গীর খীল	৬৫	৪২০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৪

থানা : হাট হাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
মির্জাপুর	৬৩	৩৭৫
গুমানমর্দন	৫৫	৩১০
রুদ্রপুর	৩০	২০০
জোবরা	১৫	১৩০০
মিরেরখিল	৩৫	২২৫
উদালিয়া	৪০	২৫০
বালুখালি	৩৩	২১৫
মাদার্শা	১০০	৭২০
চ.বি. (বিশ্বশান্তি প্যাগোডা)	৫	৩৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৫

থানা : পটিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
পাঁচরিয়া	১৩৫	১০৮০
চরকানাই	৬০	৪২০
কোলাগাঁও	৩০	২১০
লাখেরা	১৩০	১১০০
পিঙ্গলা	১২৫	৮৯৫
বেলখাইন	১০০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

কর্তালা	২১০	১৪৫০
মেহের আঁটি	২৫	১৩০
তেকোটা	১২০	৮২০
মৈতলা	৫৫	৩৮০
মুক্তনাইট	১৫০	১১০০
পায়রোল	৪০	২৬০
উনাইনপুরা	১৫০	১১২০
নাইখান	১০৫	৭২০
নাগধর	১২	৮০
করল	১২০	৮০০
ঠেগরপুনি	১২৫	৮২৫
বাকখালি	৫০	৩৩০
বরিয়া	৬৫	৪২৫
বাথুয়া	১৩০	৮১০
হুতরপটিয়া	৬০	৪০০
জোয়ারা (খানখানাবাদ)	৬৫	৪১০
ভাণ্ডার গাঁও	১১০	৭২৫
শাহ মিরপুর	৪৫	২৮৫
পটিয়া (সদর)	৭০	৩৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৬

থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
শাকপুরা	১৫০	১১০০
পশ্চিম শাকপুরা	৪৫	৩১০
গোমদণ্ডী	৫০	৩২৫
হাজারীর চর	১২৫	৮৬০
কদুর খীল	৯০	৬২৫
খরনদ্বীপ	৫০	৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

চরনদীপ	৫০	৩৪৫
জৈষ্ঠ্যপুরা	১৩০	৯০
শ্রীপুর	১০০	৬৭০
বৈদ্যপাড়া	২০০	১৪২০
সরোয়াতলী	২৫	১৭০
পশ্চিম আমুচিয়া	২৫	১৮০
পূর্ব আমুচিয়া	৩৪	২৮০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৭

থানা : আনোয়ারা, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রুদুরা	৭০	৫৬৫
তালসরা	৪৫	৪২৫
মুহুদ্দিপাড়া	১২	১৩০
কেয়াগড়	৪০	২৭০
তিশরী	৪২	৩৩০
ওষখাইন	২৮	১৯৫
চেনামতি	৭০	৫১০
বটতলী	২৫	১৭৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৮

থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
পুরানগড়	১১	৭৩
উত্তর পুরানগড়	৩৬	২৩৮
বাকরআলি বিল	৯৩	৫৭০
বড় হাতিয়া	১২৯	৭৯০
বড় দুয়ারা	৮০	৫৪০
শীলঘাটা	১৬৫	১৫০০
ঢেমশা	১৭৫	১৫৪০

Dhaka University Institutional Repository

কড়িয়ানগর	১৫০	১১২৫
রূপনগর	৪৫	৩০০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ৯

থানা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
ফতেনগর	১৭০	১০০০
কাঞ্চননগর	৪০	২২৫
কানাইমদারী	১৬০	১১০০
সুচিয়া	৮০	৭০০
মধ্যম জোয়ারা	৭০	৪৫
পূর্ব জোয়ারা	৮০	৭০০
দক্ষিণ জোয়ারা	৪৫	৪০০
সাতবাড়িয়া (বেপরী পাড়া)	১১৫	৬০০
সাতবাড়িয়া (দেওয়ানজী পাড়া)	১০০	৫৫০
ধুয়াঁর পাড়া	২৫	১৪০
বৈলতলী	১৫	৮০
পশ্চিম ধোপা ছড়ি	১২	৬৫
নাইক্ষংছড়ি	১৬	১৩৫
পূর্ব ধোপাছড়ি (চেরিরমুখ)	২৮	১৭০
হাসিমপুর	৩৫	২০০
উত্তর হাসিমপুর	৩৩	২০০
দক্ষিণ হাসিমপুর	২৮	১৭০
পূর্ব হাসিমপুর	২০	১১৫
বরমা	১৫	১০০
চর বরমা	৩৫	২২০
দিয়ার কুল	৩৫	২১৫
জামিরজুরি	১০০	৬১০
গাছবাড়িয়া	২৫	১৫০

Dhaka University Institutional Repository

মহানগর	০৫	৩২০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১০

থানা : বাশখালী, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
জলদী	৪৭০	৪৭০০
শীলকুপ	৪৫০	৪০০০
দক্ষিণ জলদী	৭০	৫০০
মিজ্রিতলা (কাহারঘোনা)	৬০	৪০০
পুইছড়ি	১০	৭৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১১

থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
মছদিয়া	২৭৫	২০০০
খুসাংগের পাড়া	৫১	২৬০
আধুনগর	৬০	৫০০
ভলুয়াকুল	৫৫	৩০০
চেঁদরপুনি	২১	৮২৭
পুটিবিলা	৮৫	৩১৫
নারিচ্ছা	৬২	৪৬২
কলাউজান	৩২	২০২
পহরচাঁদা	৩০	১৮০
লক্ষণের খিল	১০৫	১২৫০
বিবির বিলা	৫১	৪৫৬
মাইজ বিলা	১১	৮৫
আদারচর	৩২	২১৮
পদুয়া	৪৪	২৮৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ১২

থানা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
নানিকপুর	১৪৫	১০২৫
ঘুনিয়া	৪৫	৩১০
বিনিমারা (নিজপান খালী)	১৪০	১০০০
হারবাং	৪৫	২৭৫
বিন্দানীর খিল	৪৫	৩০০
মধুখালী	৪৫	৩১০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১৩

থানা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
উত্তর নলবিলা	৩০০	২২১৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি. ২০০৭

সারণি – ১৪

থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
মেরুংলোয়া	৫০০	৩৫০০
পূর্ব মেরুংলোয়া	২০০	১৪৮০
উত্তর মিঠাছড়ি	১১৫	৮৯০
চাকমার কুল	৩৫	২২০
হাজারী কুল	১০০	৮২০
রাজার কুল	৩০০	২১০০
শ্রীকুল	১০০	৭২০
নাসীরকুল	২০০	১৪৫০
ফারীরকুল	১০০	৭৩০
জাদী পাহাড়	১০০	৭১৫
উখিয়াঘোনা	৪০	৩০০
রামকোট		

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ১৫

থানা : কক্সবাজার (সদর) জেলা

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
ঝিলংঝা	৫২	৩৭০
পূর্ব ঝিলংঝা	৫০	৩৬৫
বলী পাড়া	৪৫	৩১০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১৬

থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রাজাপালং	৩৫	২৪০
হলদিয়াপালং (বড়বিল)	২০	১৫০
রুমখাঁ পালং	১৫০	১০০০
পুরাতন রুমখাঁ পালং	২১০	১৪০০
রুমখা পালং (চৌধুরী পাড়া)	১০০	৭৫০
নলবুনিয়া (পাতাবাড়ি হলদিয়া)	১৩০	৮০০
তেল খোলা	৪৫	৪০০
মারচ্যা পালং (সজনীর পাড়া)	৬৫	৪০০
পাতাবাড়ি	২৬০	১৮০০
কুতুপালং	৮৫	৫৩০
কুতুপালং-২	২০০	১৪০০
শৈলার ঢেবা	৯৫	৬৭৬
মধ্যম রত্না	১৩৫	৯৫০
পূর্ব রত্না	২০	১৫০
পূর্ব রত্না-২	৬৫	৪৫০
পূর্ব রত্না-৩	৭০	৪৭০
ভালুকিয়া পালং	১৪০	৯৫০
জালিয়া পালং	৪০	২৫০
রেজার কুল	৫০	৩০০

Dhaka University Institutional Repository

রেঙ্গুরকুল-২	৪০	২৩৫
কোটবাজার	১০৫	৯৮০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১৭

থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
সীতাকুণ্ড	৪০	২৭০
বাড়বকুণ্ড	৪০	২৮০
পান্থশালা	৮০	৫৬০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১৮

থানা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
দমদমা	৪৯০	৩৪৭৫
মায়ানী	৩২০	২২২৫
জোরারগঞ্জ	৩৫	২৪৫
তুলাবাড়িয়া	৫৫	৩৮৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ১৯

থানা : বান্দরবান, জেলা : বান্দরবান

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
বান্দরবান	২০০	১২৫০
বালাঘাটা	১৫০	৯৭০
বালাঘাটা(সদর)	৫০	৩৪০
লেবুছড়ি	১০০	৭৩০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২০

থানা : লামা, জেলা : বান্দরবান

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
লামার মুখ	৫০	৩২০
দরদাড়ি	৪৫	২৮০
বাজবাড়ি	১৫	১১০

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২১

থানা : খাগড়াছড়ি, জেলা : খাগড়াছড়ি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
খাগড়াছড়ি (সদর)	৫০	৩২০
মহালছড়ি থানা	৪০	২৮০
বোয়ালখালি (দিঘীনালা থানা)	১৫০	১০৪০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২২

থানা : রাঙ্গামাটি, জেলা : রাঙ্গামাটি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রাঙ্গামাটি	১২০	৮৪০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৩

থানা : রুমা , জেলা : রাঙ্গামাটি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রুমা সদর	১২০	৮৫০

তথ্য উৎস : বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৪

থানা : রামগড় , জেলা : খাগড়াছড়ি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
রামগড় সদর	২৫	১৮০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৫

থানা : বরুড়া, জেলা : কুমিল্লা

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
লগ্নসার	৬৫	৪০০
ঘোষপা	১৫	৭৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ২৬
থানা : চৌদ্দগ্রাম, জেলা : কুমিল্লা

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
কিংকচন্দাই	২৫	১৫০
বাগৈ গ্রাম	৩৫	২৫০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৭
থানা : কুমিল্লা, জেলা : কুমিল্লা

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
ঠাকুরপাড়া	৩৫	২০০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৮
থানা : লাকসাম, জেলা : কুমিল্লা

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
কেশনপাড়	২১	১৪০
পাইকপাড়া	১৫	৯০
ঘনিয়া খারি	৩৫	২০০
দত্তপুর	১৫	৯০
কোঁয়ার	৪০	২৭৫
নৈরপাড়	৩০	২০০
বড়ইগাঁও	৬০	৩৯০
ধুপচর	১৩০	৮৮৫
মজলিসপুর	৫০	৩৪০
আলীশ্বর	১৫০	৯৮০
নূরপুর	৫০	৩২০
আলোদিয়া	৫৫	৩৮০
চুসাতি	১৫	৯৫
কলসিয়া	১২	৭০
আমুয়া	১০	৬৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৮
থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
কোশল্যার বাগ সোনইমুড়ি	৩০	২৮০

Dhaka University Institutional Repository

মিয়াপুর	২০	১৪৫

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

সারণি – ২৯

থানা : সেনবাগ, জেলা : নোয়াখালি

গ্রামের নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
নতৈন	৩০	২৩০

তথ্য উৎস : ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ২০০৭

উপরি-উক্ত সারণীতেএদেশে বসবাসরত মোট বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পরিবার সংখ্যা ২৬০২৯২[৫৭] এবং মোট জনসংখ্যা ১,৭২৭৭৬ জন। তাছাড়া ঢাকা শহরে ১০,০০০, চট্টগ্রাম সদর ও চান্দগাঁও (চট্টগ্রাম) এলাকায় ৫০,০০০ বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাছাড়া ৬৪৬ জন বড়ুয়া বৌদ্ধভিক্ষু এবং ৫৩৭ জন শ্রামণ আছে[৫৮]। সুতরাং দেখা যায় এদেশে মোট বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ২,৩৩৯৫৯ জন বাঙালি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। উপরি-উক্ত তথ্য গবেষণায় নারী-পুরুষের কোন সংখ্যা উল্লেখ নেই।তাছাড়া এখানে উভয় ক্ষেত্রে বয়সের কোনো তারতম্য সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যউৎস

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (কলিকাতা, ১৪০৭), পৃ. ১২২-১২৪

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা,১৩৪১), পৃ.৪৭

৩. রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৭৩), পৃ. ৪৫

৪. Tāranātas, History of Buddhism in India, (Calcutta, 1980) P. 25

৫. পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, দেশে অরাজকতার সময় একইভাবে সবল দুর্বলকে নির্যাতন এবং নিপীড়ন করে।

৬. অক্ষয় কুমার মৈত্রীয়, গৌড়লেখামালা (কোলকাতা, ২০০৪), পৃ. ৪ ও ১৯

৭. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া সম্পাদিত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম (কলকাতা, ২০০৭), পৃ. ১৩৮

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৯. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ৪৩৮

১০. তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খড়্গবংশ, (৬৩০–৭০০ আনুমানিক খ্রি.), রাতবংশ(৬৪০-৬৭০ আনুমানিক খ্রি.),সমতটের দেববংশ (৭২০-৮২৫ আনুমানিক খ্রি), চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ (৮৬৫-১০৫০ আনুমানিক খ্রি.), গৌড়ের কম্বোজ বংশ (৯৮০-১০৫৫ আনুমানিক খ্রি) [বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃ. ৮০]

১১. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১২. R. C Majumder, History of Bengal (Dhaka, 1943), P.419

১৩. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রাম, ২০০৭), পৃ. ৮১

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৫. মাহবুব উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস -পুরাণা আমল (চট্টগ্রাম, ১৯৬৫) পৃ. ৭

১৬. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস (চট্টগ্রাম, ১৯৮৬), পৃ. ৩৫

১৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯৩), পৃ. ৭

১৮. নীরু কুমার চাকমা, বুদ্ধ ধর্ম ও দর্শন (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ৯৭

১৯. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৯৭)

২০. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (কলিকাতা, ১৯৯৫), পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

২১. Sukomal Chaudhuri, Contemporary Buddhism in Bangladesh (Calcutta, 1982), P. 46

২২. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ১৬

২৩. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৪. Dharmaraksit Mahathera,The Singha Buddhist Community oF Bangladesh (Comilla, 1999), P. 5

২৫. রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৬. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রাম, ১০৮৪), পৃ. ৯

২৭. আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী (ঢাকা, ১৯৯৪),পৃ. ১৬৪

২৮. W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal,Voll-vi (London, 1876), P.143

২৯. পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ১৬৯

৩০. Risely, H. H The Tribes and Castes of Bengal, Voll-ii (1981), P. 29

৩১. কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা (আগরতলা, ১৪০৫) পৃ. ১৬৭

৩২. সাধন কমল চৌধুরী, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবির্বতন (কলিকাতা, ২০০২),

৩৩. ব্রহ্মাণ্ডপ্রতাপ বড়ুয়া সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

৩৫. দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, তারিখ : ২৭/১২/ ১৯৮৭

৩৬. দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, তারিখ : ২৬/১২/ ১৯৮৭

৩৭. বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা, ১৩৬৪ বাংলা) পৃ. ৩৯-৪০

৩৮. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১০৭৯), পৃ. ১৪৭৯

৩৯. দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, তারিখ : ২৫/১২/ ১৯৮৭

৪০. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪১. অতুল সুর, বাঙালি জীবনের নৃতাত্তিক রূপ (কলিকাতা, ১৯৯২), পৃ. ৬৩-৬৪

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৪৩. Dr. S. L. Baruah, A Comprehensive History of Assam (NeW Delhi, 1985), P. 671

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. উদ্ধৃত, আবদুল হক, প্রবন্ধ বিচিত্রা (ঢাকা, ১৯৯৫) পৃ. ২০৭

৪৫. Sir Edward Gati, Hitory of Assam (Calcutta) P. 195

৪৬. Ibid, P. 195

৪৭. সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬), পৃ. ৮

৪৮. কালীপ্রসন্ন সেন, রাজমালা, ২য় লহর (ত্রিপুরা, ১৯২৭), পৃ. ১২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৫০. বিরাজমোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (রাঙ্গামাটি : ২০০৫),পৃ. ১০০

৫১. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি (কলিকাতা, ১৩১৬), পৃ. ৬১

৫২. Dharmaraksit Mahathera, op.cit, P.2

৫৩. Dharmaraksit Mahathera, op.cit,P. 2-3

৫৪. Dharmaraksit Mahathera, op.cit, P. 4

৫৫. মানবাধিকার : বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী, ডি.পি. বড়ুয়া। বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

৫৬. Population Census-1, Bangladesh Brueah of Statistic, Planing Division, Ministiry of Planing (Dhaka, 2003), p. 13, 66

৫৭. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩-২৮০

৫৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কীর্তনের উৎপত্তি ও বিকাশ

সংস্কৃতজাত অর্থবোধক একটি পদের নাম 'কীর্তন' যা 'কৃৎ' ধাতুযোগে গঠিত। এখানে 'কীর্তন' শব্দের সাধারণ অর্থ 'সংশব্দন', 'কথন, 'গুণবর্ণন', 'প্রশস্তি' 'যশোগীতি' 'ঘোষণা'। তবে কীর্তন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। পালি পিটক বর্হিভূত সাহিত্যের (Non-Canonical Texts) অন্যতম একটি গ্রন্থের নাম 'দাঠাবংস' অর্থাৎ বুদ্ধের দন্তধাতুর ইতিহাস। এ গ্রন্থের একটি গাথায়[১] এ কীর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন :

ধম্মিস্সরো নিখিললোকহিতায লোকে
জাযিত্থ সব্বজনতাহিতমা চরিত্থ
বিত্থারিতা বহুজনস্স হিতায ধাতু
ইচ্চান ধাতুমভি পূজযিতুং ময়ম্পি।

এখানে কীর্তনের সুরে ঘোষণা করা হচ্ছে ধম্মরাজ বুদ্ধ নিখিল জগতের হিতার্থে ধরণীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বজনহিত সাধন করেছিলেন। বহুজনের হিতার্থে ধাতু বিত্তারিত হয়েছিলো, আমরাও ধাতু পূজা করতে ইচ্ছা পোষণ করি। সুতরাং বলা যায়, বহুজনের মিলনের মাধ্যমে কীর্তন পরিবেশন হওয়া স্বাভাবিক। আবার শ্রীমদ্ভাগবত[২] এ একটি শ্লোকে এই অর্থের ইঙ্গিত আছে এ ভাবে :

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মাল্ম।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ।

অর্থাৎ সুন্দর দেহ, মাথায় ময়ূর পুচ্ছের ভূষণ, কানে কর্ণিকার ফুল, পরণে সোনার মতো উজ্জ্বল পীতবাস, গলায় বৈজয়ন্তীমালা (পরিয়া), অধরে ন্যস্ত বেণু বাজাতে বাজাতে নিজ শীলাভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তখন গোপগণ চারদিকে তাঁর কীর্তি গান করতেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই উল্লেখ করেছি 'কৃৎ' ধাতুজাত কীর্তন অর্থ প্রশংসা করা। 'দাঠাবংস' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবতম' নামক গ্রন্থে কীর্তিমান নরোপুরুষের প্রশংসা স্তুতি করা হয়েছে। এখানে কীর্তি ও কীর্তন এ দুটি শব্দই 'কৃৎ' ধাতু থেকে আগত। এ প্রসঙ্গে আরো উক্ত আছে :

> Traditionally, Kirtan is call and response, chanting of Sanskrit mantras set to simple melodies desined to quiet the mind, deepen the breath and expond one's sense of conscious connection to self and source [৩]

এ বিষয়ে আরো উল্লেখ রয়েছে ;

> Kirtan is away of religious emotional energy, from tolove, through the vehicle of vocal sound. It is a deceptively simple practice which involves pouring emotional exprtession into the singing of respective melodies which has the effect of washing away the chatter of the analytical mind[৪].

সুতরাং বলা যায় রূপে, শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম স্মরণ, গুণ, বর্ণনাকরণ, যশোসূচক কিংবা যশোকথাময় গীতির নামই 'কীর্তন'। 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থে কীর্তনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : নাম লীলা গুণাদিনামচ্চৈ র্ভাষা তু কীর্তনম্।[৫] অর্থাৎ নাম লীলা গুণাদি, উচ্চস্বরে করার নামই হলো কীর্তন। বৌদ্ধ কীর্তন সম্পর্কে প্রায়ই সকলেই এক বিষয়ে একমত বুদ্ধ নামক মহাপুরুষেরা চিরকাল ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে চিরদিন জাগরুক রয়েছে। সকলের নিকট তিনি গুণান্বিত ; সকলের নিকট তিনি নমস্য ; সকলের নিকট বন্দনাযোগ্য। অন্যভাবে বললে বলা যায় ; তিনি সকলের পথ প্রদর্শকও বটে । তাঁর মহিমা অকল্পনীয় । তাঁর নাম, গুণ, যশোকথা আবৃত্তি গান কীর্তনের অন্যতম বিশ্লেষণাত্মক বহির্প্রকাশ। কীর্তন অনুরাগীজন বরাবরই কীর্তন শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, এটিই বর্তমান প্রচলিত কীর্তনের অংশ। কীর্তন একদিন বাংলাকে

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ করেছিল। বাঙালিকে পাগল করেছিল।[৬] বাঙালি ভাব-প্রবণ গীতি প্রধান এক জাতি। এ রকম গীতগানের মাধ্যমে বাঙালির সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের বাঙালি লোকসংস্কৃতির এক অতুলনীয় নিরুপম তথা অত্যুৎকৃষ্ট সম্পদ কীর্তন। শ্যামল বাংলার চির পরিচিত কীর্তন হলো এক প্রকার লোকগান। কীর্তনের মাধ্যমেই সংগীত পিপাসুরা একদিকে পায় অনাবিল নির্মল শান্তির পরশ আবার অন্যদিকে সমৃদ্ধতায় ভরে তুলে নিজের জ্ঞানকে। এখনো পর্যন্ত কীর্তন বলতে গ্রাম বাংলার মানুষ পাগল প্রায়। কীর্তনের আওয়াজ শুনলেই হৃদয়-মন পুলকিত হয়, পরম আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে মানসহৃদয়। 'বাংলা গানের জগৎ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ;

> বাংলার কীর্তন বাংলার এক জাতীয় সম্পদ। এ গানের ধারায় যেমন কাব্য ভাবের উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায় তেমনি বাংলার নিজস্ব সংগীতের প্রতিভার জারকরসে জারিত সুরের ঐশ্বর্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বাক্য আর সুর এখানে গলাগলি করে মিশে আছে। আর এ দুই অংশই এ গানে নাটকীয়তার ভাব খুব প্রবল। বাকী অংশে নাটকীয়তা এসেছে। তার আখর যোজনায়। আর সুরাংশে এই নাটকীয়তার আরোপ হয়েছে দুরূহ সবতাল-লয়ের অপূর্ব সুরসামঞ্জস্য মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে।[৭]

কীর্তন বহুল পরিচিত নন্দিত ধর্মীয় কিন্তু লোকজ সংগীতের নাম। সংগীত মানে নাটকীয়তার উপস্থিতি বিরাজমান। যেহেতু কীর্তন সংগীতেরই একটি অংশ সেহেতু কীর্তনেও নাটকীয়তা থাকা স্বাভাবিক। তাই উক্ত আছে ; এ নাটকীয়তাই হলো বাংলা কীর্তনের প্রাণ।[৮] কীর্তনের নাটকীয়তাই হলো কীর্তনের মুল উপজীব্য বিষয়। নাটকীয়তার উপলব্ধি করার জন্য দর্শক শ্রোতা কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই দর্শকের চাহিদার কারণে কীর্তনীয়া নিজেই সময় সময় এ রকম নাটকীয়তা সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন উদ্‌গাহ মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ অনুসারেই রচিত অর্থাৎ আধুনিক কালের সাংগীতিক ভাষায়, স্থায়ী, অন্ত রা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি কলিতে নিবদ্ধ। কীর্তনে যে সব তালের উল্লেখ পাওয়া যায় তা প্রাচীন সংগীতে এবং দক্ষিণী তালের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। তালগুলো যেমন দক্ষিণী সংগীতে এখন প্রচলিত তেমনি বাংলা কীর্তনেও এর প্রচলন আছে।[৯] ঈশ্বর ভগবানের গান বা স্তুতিগান করার প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুবই প্রাচীন। তবে ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তনের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমনটি ধারণা করা যায়। দাক্ষিণাত্যেই[১০] ইহার সূচনা হয়। ভক্তিধর্মের মূল উৎস ছিল শ্রীকৃষ্ণের গুণগান। ভাগবতে বিষ্ণুভক্তি লাভের নয়টি[১১] উপায় নির্দেশ করা আছে। যেমন : ক. শ্রবণ, খ. কীর্তন, গ. স্মরণ, ঘ. পাদসেবন, ঙ. অর্চন, চ. বন্দন, ছ. দাস্যভাব, জ. সখ্যভাব এবং ঝ. আত্মনিবেদন। কীর্তনের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এখানেও কীর্তনকে অতি সম্মানের সাথে উপরের দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কীর্তন ধর্মীয় সংগীত। বিষয়কে আবেগ মিশ্রিত সুর দিয়ে পরিবেশন করাই হলো কীর্তনের প্রচলিত রীতি। কীর্তনীয়া যখন ধর্মের বিষয়কে আবেগ মিশ্রিত সুর দিয়ে পরিবেশন করেন তখন সমবেত উপস্থিত সকলেরই হৃদয় মন আবেগে সিক্ত হয়ে উঠে। কীর্তনের হৃদয় জাগরণী সুর, ছন্দোবদ্ধাকারে পরিবেশিত কাব্য এবং ধর্মীয় রসের অপূর্ব এক সমন্বিত শিল্পের পরিচয় বহন করে। এখানে সুরের আবেদনে প্রাণ সঞ্চার হয় ; কাব্য রসে মুগ্ধ হয় চিত্ত এবং ধর্মের জটিল বিষয়গুলো সহজেই সমাধানের সম্ভাবনা প্রোৎসাহ অন্তরে জাগে ।

বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাগানের সমৃদ্ধতম প্রাচীন উপাদান চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। চর্যাগুলোকে পদাকারে পরিবেশন করা হতো বলেই এগুলো চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে অত্যধিক পরিচিত। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক থেকে দশম কিংবা একাদশ শতকের মধ্যে এগুলো রচিত হয়েছে এরূপ ধারণা করা হয়। মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যরাই এ পদগুলো রচনা করেন। বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় এগুলোকে বাংলা ভাষার প্রাচীন এবং আদিরূপ বলে ধরে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধাচার্যরা বৌদ্ধধর্মীয় আচার-আচরণ কিংবা বিধিনিষেধের উপর পদ রচনা করতেন। পদ রচনা ছাড়াও তাঁরা আবার পদগুলোকে সুরারোপ করতেন। ১৯০৭ খ্র. নেপালের রাজদরবারে গিয়ে কিছু পুঁথি দেখতে পান মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার একটির নাম চর্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়। এখানে কতগুলো কীর্তনের পদ আছে যা বৈষ্ণবদের কীর্তন গানের ন্যায়। এতে অনুমান হয় যে, সেকালেও কীর্তন ছিল আর কীর্তনের গান গুলোকে চর্যাপদ বলা হতো[১২]। চর্যাগীতি কীর্তনের প্রভাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেন, কীর্তন গানের সঙ্গে চর্যাগীতির সঙ্গে তেমন কোন ভিন্নতা নেই। কীর্তন গীতপদ্ধতিতে চর্যাগীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা খুবই স্বাভাবিক।[১৩] চর্যাগীতির এ গানগুলো আধ্যাত্মিক। চর্যাগীতিকার কিংবা অনেকেই মিলে সমবেত কণ্ঠে এ গান পরিবেশন করতেন। তাছাড়া প্রজ্ঞানন্দ স্বামী মনে করেন ; নাথযোগী প্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও চর্যার মতো আধ্যাত্মিক গান পরিবেশন করা হতো।[১৪] তবে এটা ঠিক যে, বাংলা ও তার আশে-পাশের এলাকাগুলোতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের[১৫] মধ্যে এ গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, চর্যাগীতি পদগীতি কীর্তনের পূর্বসূরী।

পালরাজরা ৭৫০ খ্রি. থেকে ১১৫০ খ্রি. পর্যন্ত এদেশ শাসন করেছিলেন। এ সময় বৌদ্ধধর্ম খুবই সমৃদ্ধ একটি ধর্ম ছিল। সাহিত্যে, শিল্প, সমাজ, সভ্যতায় আর্দশ সমাজবির্নিমানে এ পাল রাজাদের অবদান অতুৎজ্জ্বল। পাল বৌদ্ধদের পতনের সাথে সাথেই কীর্তনগান একেবারে হারিয়ে যায়। চৈতন্যপূর্ব যুগের রাধাকৃষ্ণ লীলার পদকার ছিলেন জয়দেব এবং বাংলায় চন্ডীদাস, মিথিলায় বিদ্যাপতি, মালাধয় বসু (যশোরাজ খান) এবং ত্রিপুরার রাজ পণ্ডিত। ছাড়াও চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি রয়েছেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে পদ রচনা ও সুর সংযোজনা করতেন যা পদাবলী নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। চৈতনদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) এ কীর্তনকে একটি বিশিষ্টরূপ প্রদান করেন। বলা যায়, চৈতন্যের প্রভাবে গ্রাম বাংলায় নব উদ্যোমে আবার কীর্তনের জোয়ার শুরু হয়। শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্যের সময়কাল থেকেই পদ এর পরির্বতে কীর্তন শব্দটির প্রচলন শুরু হয়। পদ রচনা ও কীর্তন রচনা একই পর্যায়ের এবং একার্থবোধক। পদাবলী একক গায়কের গান আর কীর্তন একক

Dhaka University Institutional Repository

সমবেত কণ্ঠের গান।[১৬] এভাবে 'পদ' পরিবর্তিত হয়ে যখন কীর্তন হয় তখন কীর্তন সবমহলে এক বিশেষ জায়গা করে নেবে এমনটি স্বাভাবিক। তবে 'পদ' পরিবর্তন হবার হওয়ার সাথে সাথেই কীর্তনে তাল-লয়েরও বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। কীর্তন দু'রকমের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় : ১. কথকতা কীর্তন বা শুক কীর্তন এবং ২. নারদীয় কীর্তন। শেষোক্ত নারদীয় কীর্তনের অনেক উপরিভাগ আছে তার মধ্যে বন্দনা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, আরতি কীর্তন, অধিবাস কীর্তন, পরবগান কীর্তন, সূচক কীর্তন, নাম কীর্তন, পদাবলী ও লীলা কীর্তন বা পালা কীর্তন। তবে উল্লিখিত কীর্তন গুলো কোনটির সৃষ্টি একই সময়ে এরূপ বলা যায় না কখনো। পদাবলী ও পরবগান প্রাচীন হলেও পরবর্তীতে সেগুলো লীলাকীর্তনের রূপ পরিগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যে দেবের আর্বিভাবে নাম কীর্তনের রূপায়ণ এবং বৈষ্ণবীয় ভজন প্রণালী সূত্রে বন্দনা প্রার্থনা, আরতি ও অধিবাসের সূচনা হয়। সূচক গান ও প্রাচীন কালে সৃষ্টি। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পর্ষদবৃন্দের সূচক ষোড়শ শতকের প্রকরণ। মূলত এ সময়ের মধ্যে পুরো বাংলায় কীর্তন ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া উক্ত সময়ের মধ্যেও কীর্তনের কয়েকটি শাখা গড়ে উঠে।[১৭] যথা ক. গড়ের হাটি বা গড়ান হাটি, খ. মনোহর শাহী, গ. রানীহাটি, বা রেনেটি, ঘ.মন্দারিনী এবং ঙ. ঝাড়খন্ডী। এই পাঁচটি ধারাকে ধ্রুপদ খেয়ালের পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। উপরি-উক্ত ধারাগুলো কীর্তনের প্রধান গায়ন রীতির প্রতিভূ। উৎপত্তি স্থনের নামানুসারে এ গীতগান পদ্ধতিগুলোর নাম হয়েছে।

ক. গড়ের হাটি বা গড়ান হাটি : এ ধারার প্রবক্তা নরোত্তম ঠাকুর। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতিতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপন্যান্তে তিনি নিজ গ্রাম খেতরীতে ফিরে আসেন ও কোন এক উপলক্ষে এক বৈষ্ণব সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে নরোত্তম প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা লীলাকীর্তন গাওয়ার রীতি প্রর্বতন করেন। নরোত্তম যে পদ্ধতিতে লীলাকীর্তন পরিবেশন করেছিলেন তাই গড়ের হাটি বা গড়ান হাটি বলে খ্যাত।

খ. মনোহরশাহী : নরোত্তম সম্মেলন ও কীর্তন গায়ন উপস্থাপনার ফলে এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এ উৎসব থেকে ফিরে এসে জ্ঞানদাস মনোহর, বদন ঠাকুর, নৃসিংহ ঠাকুরের সহযোগিতায় রাঢ় অঞ্চলের সংগীত

Dhaka University Institutional Repository

ধারার সংস্কার করেন ও কীর্তন পরিবেশনের একটি বিশিষ্ট ধারার প্রর্বতন করেন। পূর্বেকার বীরভূমের কান্দারা অঞ্চলে এ গীতরীতি উদ্ভূত হয়। কান্দারা মনোহরশাহী পরগনার অর্ন্তভূক্ত ছিল বলে মনোহর শাহী নামে খ্যাত।

গ. রানী হাটি বা রেনেটি : পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ এ ধারার প্রর্বতক। বর্ধমান জেলার রানী হাটি পরগনার নামানুসারে এ ধারার নাম রাখা হয় রানী হাটি বা রেনেটি। বিপ্রদাস রানী হাটি পরগনার অধিবাসী ছিলেন।

ঘ. মন্দারিণী : সরকার মন্দারণ নামক কীর্তনীয়ার প্রর্বতিত লীলাকীর্তন ধারা মন্দরিণী নামে খ্যাত। এ ধারায় মঙ্গলগীতির সুর ভঙ্গিমা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

ঙ.ঝাড়খন্ডী : ঝাড়খন্ড অঞ্চলের উদ্ভূদ লীলাকীর্তনের এ রীতিকে ঝাড়খন্ড বলা হয়। লোকসুর ও মঙ্গল গীতির সুর উভয়ের মিশ্রণেই ধারাটি গঠিত।

উপরি-উক্ত কীর্তন ছাড়াও চাপ কীর্তন, পাল্টা কীর্তন এবং প্রভাব ফেরী কীর্তনের নাম দেখা যায়।[১৮] চর্যাপদ কিংবা চর্যাগীতি পরবর্তী সময়ে রচিত সকল কীর্তনের বিষয় ছিল হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তখন রচনা করা হতো কীর্তন। কীর্তন বাঙ্গালী বাঙলা প্রধান গান। এটি বাঙ্গালীর নিজস্ব গানও বটে। ধারণা করা হয়, এ রকমের কীর্তন গান থেকে বাঙ্গালী প্রথম গানের সৃষ্টি করে।[১৯] বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসার দাবীদার। তিনি বলেন ; বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে এবং সংগীতে এক অপূর্ব মিল সৃষ্টি হয়েছে।[২০] সূদুর জাপানেও বর্তমানে কীর্তন পরিবেশিত হয়। এ বিষয়ে দেখা যায়; In Japan, Followers of Shinto religion engage in ritulistic chants known as norito which is their version of kirtan. Buddhist hymns are refered to as shomyo. This is a form of Kirtan as well. [২১] মূলত এ কীর্তন এখন এ দেশে লোকসাংস্কৃতিক ধর্মীয় গানের একটি অংশ বিশেষ। নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই প্রতিধ্বনি ঘোষণা করে। It is the most prominent medium of the musico-religious expression. [২২]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যউৎস

১. ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, দাঠাবংস, অপ্রকাশিত, পৃ. ৫৮

২. শ্রীমদ্ভাগত-১০/২১/৫

৩. htt//: www. Jstor.org/pss

৪. htt//: www. Seanjohnson kirtan.com/kirtan.html

৫. রূপগোস্বামী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১/২/৬৩

৬. বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারতবর্ষ (কলিকাতা, ১৯৯৯),পৃ. ৪০৩

৭. নারায়ণ চৌধুরী, বাংলা গানের জগৎ (কলিকাতা, ১৯৯১), পৃ. ২

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৯. মৃদল কান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ৩৯

১০. দাক্ষিণাত্য বলতে তামিলনাড়ু ও কেরলাকে বোঝায়।

১১. ভাগবতে, ৭৫/৫/২৩-২৪

১২. মহোমহোপধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোঁহা (কলিকাতা, ১৩২৩), পৃ. ৪

১৩. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী (কলিকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৪১

১৪. প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ১১৬-৪২

১৫. মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় : বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের শত বৎশর পর বৌদ্ধসংঘ স্থবিরবাদ(থেরবাদ) এবং মহাসাঙ্গিক এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীনপন্থী অর্থাৎ মূল বুদ্ধোপদেশ অবলম্বীদেরকেই স্থবিরবাদ কিংবা থেরবাদ বলে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় সংগীতিতে নিন্দিত বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই কৌশাম্বীমন্ডলে এক মহাসভায় মিলিত হন এবং সেই সভার সিদ্ধান্তে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা মহাসাঙ্গিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সর্বসম্মতভাবে মহাসাঙ্গিক হতে মহাযানের উদ্ভব হয়। বোধিসত্ত্বগণের সাহায্যে মুক্তি লাভের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় অর্থাৎ বোধিসত্ত্ববান কালক্রমে 'মহাযান' নামে পরিচিতি লাখ করেছিল। সার্বিক মুক্তি আদর্শ হওয়ায় এ রকম যানকে মহাযান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ নির্বাণ প্রাপ্তির মার্গ। মহাযানের প্রাচীনতম গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে আমরা মার্গ শব্দের প্রচলন দেখতে পাই। সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি অধিবেশনে বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের জন্মলাভ করে। মহাযানপন্থীরা বুদ্ধ ও বুদ্ধের উপদেশ মানেন কিন্তু তাঁরা বুদ্ধের শিক্ষার তুলনায় গুরুত্ব দেন বুদ্ধের করুণাময় চরিত্র কিংবা আর্দশের উপর। তাই তাঁদের আদর্শ হলো বোধিসত্ত্ব ; তাঁদের মতে যেই পর্যন্ত তিনি স্বীয় প্রযত্নলব্ধ নির্বাণকেও স্বীকার করবেন না। একক নির্বাণ লাভ তাঁদের মতে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও হীন আর্দশ। পরন্তু পরমুক্তির জন্য আত্মবিমুক্তি ত্যাগ করাই পরার্থতা এবং মহান আদর্শ।

১৬. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া. বুদ্ধ সন্ন্যাস (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬), পৃ. ৫

১৭. করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ১০৯–১১০

১৮. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী (কলিকাতা, ১৩৪৫) ভূমিকা দ্রষ্ঠব্য

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

২০. নারায়ণ চৌধুরী, বাংলা গানের জগৎ, পূর্বোক্ত, পৃ.২

২১. htt// : www.boudlemanadala.com/kirtan

২২. htt// : www. Floweringlotus.com Sec-level/kirtan.html

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক ধারা : কীর্তন

সবুজ ছায়ায় ঘেরা সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলার এ বাংলাদেশ। নদী মাতৃক বাংলাদেশ। গানের দেশ বাংলাদেশ। কীর্তন, জারি, মারফতী, ভাটিয়ালি, মুর্শিদা, লোকসংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক সব সংগীত নিয়ে আমাদের গানের অহংকার। বাঙালি লোকসংস্কৃতির অনুপম সম্পদ কীর্তন। বিভিন্ন কীর্তনের মধ্যে বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তন এক লোকসাংস্কৃতিক অবস্থান রয়েছে। কীর্তন কোথায়, কখন এবং কিভাবে পরিবেশন করা হতো তার ইতিহাস তেমন পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ/সপ্তম শতকে বাঙালি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা ধর্মীয় বিষয়বস্তু, নিয়ম - নীতি, আচার-আচরণ নিয়ে একধরণের পদ রচনা করতেন এবং সুর দিয়ে গান করতেন। এগুলো চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে সমধিক পরিচিত। মূলত এগুলোই কীর্তনের আদি নিদর্শন। পরবর্তীকালে এ চর্যাগীতি বা চর্যাপদ একসময় সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এগুলোকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। চৈতন্যদেবের সময়ে (১৪৮৬–১৫৩৩) এটি পদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ঊনবিংশ শতকে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উন্মেষ সাধনের ফলে পুনরায় কীর্তনের প্রচলন শুরু হয়। এ সময় হারানো লোকসাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ঐতিহ্য ফিরে আনার জন্য এগিয়ে আসলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কীর্তনীয়া মোহন চন্দ্র বড়ুয়া।[১] তিনি এ দেশের বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম নন্দিত ব্যক্তি যিনি নিজে কীর্তন রচনা করতেন এবং সুরারোপ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি কীর্তনীয়া হিসেবে আবার কীর্তনও পরিবেশন করতেন। পরবর্তী সময় প্রয়াত সর্বানন্দ বড়ুয়া, প্রয়াত বিশ্বম্ভর বড়ুয়া, প্রয়াত বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রয়াত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রয়াত সন্তোষ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রয়াত ক্ষীরোদ চন্দ্র বড়ুয়া, প্রয়াত সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, প্রয়াত প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, প্রয়াত মনমোহন বড়ুয়া, প্রয়াত বজ্রকিশোর বড়ুয়া প্রমুখজন কীর্তনকে এক লোকসাংস্কৃতিক শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য অবিরাম সাধনা করে গেছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কীর্তন আজ সর্বমহলে বহুল পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত পদকে সুরারোপের মাধ্যমে পরিবেশন করাই হলো বৌদ্ধ কীর্তন। তাছাড়া তার শিষ্যদের যশোগাথাময় কীর্তি-কাহিনীমূলক কাহিনীও কীর্তনাকারে পরিবেশন করা হয়। কীর্তন যিনি পরিবেশন করেন তিনি কীর্তনীয় নামে পরিচিত। প্রয়াত মোহন চন্দ্র বড়ুয়া (১৮৮১-১৯৭৫) প্রথমে অবতার লীলা[২] এবং পরবর্তীসময়ে সিদ্ধার্থের জন্ম ও বাল্যলীলা নামে দু'টি বই প্রকাশ করেন। তারপর ঢপ কীর্তনের[৩] ন্যায় বুদ্ধ সন্ন্যাস প্রকাশ করলেন তিনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ কীর্তনের মাধ্যমেই বুদ্ধের জীবনকথা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ছাড়াও তাঁর শিষ্যদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনী উপলব্ধি করতে লাগলো। এদেশ লোকসাংস্কৃতিক দেশ আর লোকসংগীত এদেশের অমূল্য সম্পদ। গ্রামবাংলার অগণিত জনসাধারণ এ গান কিংবা সংগীতের মূল দর্শক হলেও শহর কিংবা নগরেও এ গান নিজেই নিজের স্থান করে নিয়েছে। তারমধ্যে এদেশে বসবাসরত বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তন অন্যতম। কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে। এ কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গই বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নীচে এ কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো।

কথা

লীলা কীর্তনের পালাগানে ব্যবহৃত পদের ন্যায় বৌদ্ধ কীর্তনেও পদ থাকে। একপদ হতে অন্যপদের ভাব-ব্যঞ্জনময় যোগসূত্র বা পদ্যাংশের অর্থ বুঝিয়ে কিংবা ঘটনানুক্রম বোঝানোর জন্য নায়ক-নায়িকা, প্রহরী, সখা-সখীর উক্তি বলে কীর্তনীয়া নিজের মতো কীর্তনে যা পরিবেশন করেন তার নাম 'কথা'। বৌদ্ধ কীর্তনে কথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় কথা ব্যতীত কীর্তন প্রাণহীন দেহের মতো যা দর্শক-শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করতে পারে না কখনো। এককথায় বলা যায়, কথাবিহীন কীর্তন শ্রুতিমধুরহীন হয়ে পড়ে।এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে ; একটি পদ গাওয়ার পর অন্যপদ গাওয়ার পূর্বে কীর্তনীয়া উভয়পদের সংযোগসূত্র স্বরূপ যা বলে থাকেন তাই 'কথা'।[৪] কয়েকটি 'কথা' এর উদাহরণ নীচে প্রদান করা হলো।

ক. অনুচরেরা এসে মহারাজকে নিবেদন করলেন; সেই অপরূপ সন্ন্যাসী পাণ্ডব শৈলস্থিত এক পাহাড়ী ঝরণা হতে পানীয় জল সংগ্রহ করে তার ভিক্ষালব্ধ অন্ন পর্বতের পার্শ্বে এক বৃক্ষছায়ায় বসে আহার করলেন এবং নিকটবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। অনুচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে রাজা বিম্বিসার সপরিষদ সেই গিরিগুহায় উপনীত হয়ে বন্দনা করত আসন গ্রহণ করে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন এবং বললেন ; প্রাসাদ চত্বর থেকে আপনার সৌম্য চেহারা দেখে জানতে এসেছি কে আপনি কেনই বা এ নবীন বয়সে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন। চেহারা দেখে মনে হয় উচ্চ রাজবংশ সম্ভুতই হবেন। জানি না কোন সে হতভাগ্য রাজা, যার গৃহ অন্ধকার করে বেরিয়ে পড়েছেন আপনি। রাজদণ্ড ধারণোপযোগী ঐ বলিষ্ট হস্তে ভিক্ষাপাত্র নিতান্তই অশোভন। পিতৃস্নেহের ঔদার্যে যদি পিতৃরাজ্য আপনার কাম্য না হয়, আসুন ! অপুত্রক রাজা আমি, বিনাদ্বিধায় আমার রাজ্য গ্রহণ করুন। যদি ধর্মানুরাগই আপনার সন্ন্যাসের কারণ হয় তা'হলে বার্দ্ধক্য আসার আগে আনন্দ উপভোগ করে নিন। বার্দ্ধক্যই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃষ্ট সময়।

মহারাজ ! হিমালয়ের সানুদেশে কপিলাবাস্তু নগরীতে রাজত্ব করেন, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ শুদ্ধোদন। সুবিস্তির্ণ তাঁর শাক্যরাজ্য, বিপুল তাঁর পরাক্রম আর অতুল তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁরই একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি, সিদ্ধার্থ গৌতম আমার নাম। ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরে আকণ্ঠ নির্মজিত ছিলাম আমি। একাদিক্রমে জীবনের উনত্রিশটি বৎসর কিন্তু জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় না পেয়ে প্রকৃত সুখ ও স্থায়ী শান্তি লাভের আশায় আত্মীয় ও প্রিয়-পরিজন ছেড়ে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। মহারাজ ! আপনার উদারতা ও ধর্মজ্ঞান বিশ্ব-বিখ্যাত। আপনার অনুরোধ রক্ষণে অসমর্থ। পার্থিব ভোগসম্পদের ক্ষণ-স্থায়ীত্ব উপলব্ধি করেই আজ আমি মুক্তি পথের পথিক। পুনরায় সংসার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা বৃথা। নিজের মুক্তির জন্য এবং জীব-জগতের কল্যাণের জন্য, আমি চলেছি মুক্তি পথের সন্ধানে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাঁধাই আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে সমর্থ হবে না। মহারাজ ! ধনে জনে পূর্ণ হোক আপনার রাজ্য। হোক সুখ শান্তির আগার। আপনার হাতে রাজদণ্ড ন্যায় ও ধর্মের দণ্ডে পরিণত হোক। তখন মহারাজ সিদ্ধার্থের চরণ বন্দনা করে বললেন ; আপনার মত দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি নিশ্চয়ই অভীষ্ট লাভে সক্ষম হবেন। প্রার্থনা এই ! সিদ্ধি লাভান্তে প্রথমেই আসবেন মগধে, শিষ্যত্বে বরণ করবেন আমাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধার্থ পাণ্ডব শৈলের গিরি-গুহা ত্যাগ করে নির্বিঘ্নে ধ্যান-ধারণার জন্য অধিকতর নির্জন গৃধ্রকূট পর্বতে উপনীত হলেন, সেখানে প্রতিবেশী বহু তাপসদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ধ্যান-সমাধির বিষয় ও নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা ও অধ্যয়নে চিত্তের প্রশান্তি বেড়ে গেল এবং প্রতিবেশী তাপসগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাম রাখলেন মহাশ্রমণ। কিন্তু এখানে থেকেও তার অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি বৈশালীর পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন একজন রক্ষক দণ্ডহস্তে ছাগলপাল তাড়া করে নিয়ে চলেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন রাজা বিম্বিসার পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ঞে এক হাজার পাঠাবলি দেবেন তাতে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হয়ে বর দেবেন পুত্র লাভের। সিদ্ধার্থ রক্ষী এবং ছাগলপালসহ যজ্ঞভুমিতে প্রবেশ করে বললেন, মহারাজ ! আমার একটি প্রার্থনা আছে। তাপসবর ! পূর্বেই বলেছি আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। মহারাজ ! এই ছাগ শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাই আমি। তা কি করে হয় মহাশ্রমণ ? অপুত্রক আমি গুরুর উপদেশে পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞের আয়োজন করেছি। যজ্ঞ সমাপ্ত প্রায়। সহস্র পাঁঠা বলি দিয়ে আহুতি দেওয়া হবে ঐ হোমাগ্নিতে। তাতে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হয়ে বর দেবেন পুত্র লাভের। মহারাজ ! আপনার যজ্ঞ পণ্ড করা বা তাতে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি বিনারক্তে আপনার আরাধ্য জগন্মাতা তৃপ্ত না হয় ঐ ছাগ শিশুর পরিবর্তে আমাকেই বলি দিন। আমি স্বেচ্ছায় দিচ্ছি এ আত্মবলি। ঐ ছাগ শিশুত স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিচ্ছে না। ঐ শুনুন তার কাতর ক্রন্দন। যে জগন্মাতার কাছে আপনি পুত্র কামনায় ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছেন, ঐ ছাগ শিশুও মা মা করে আর্তস্বরে সেই জগন্মাতারই কাছে প্রাণভিক্ষা করছে। জগন্মাতা আপনার যেমন মাতা ঐ ছাগ শিশুরও মাতা। কিন্তু জানি না, তিনি কোন নিষ্ঠুর জননী যিনি নিজে সহস্র সন্তান রক্তের আহুতি পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বর দেবেন আপনাকে। জননী হলেও নিশ্চয়ই রাক্ষুসে জননী তিনি। স্নেহ-মমতাময়ী বরাভয়-দায়িনী যে জগন্মাতার কল্পনা আমরা করি, তা তিনি নিশ্চয়ই নন। আমাকে বলি দিয়ে আমার রক্তে আহুতি দিন যাতে আপনার যজ্ঞও সিদ্ধ হয়, আর এই অবোধ ছাগ শিশুরও প্রাণ রক্ষা হয়। তাপসবর ! নিজগুণে অযাচিতভাবে আমার সত্যদৃষ্টি উন্মোচিত করে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন আমাকে। আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হল বিনাশর্তে। আশাকরি আমার প্রার্থনাও

Dhaka University Institutional Repository

মনে আছে আপনার। অধীর আগ্রহে আমি প্রতীক্ষা করে থাকব সেই শুভ দিনের। নির্বাপিত কর যজ্ঞের অনল। বন্ধ হল আজ হতে সমস্ত মগধরাজ্যে পশু বলি। সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে তাঁর পূর্বশ্রুত আড়ার মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন।[৫]

খ. সেই দুই অন্তের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আর্য্যনীতি ত্যাগ করে লোভ, দ্বেষ ও মোহবশে কেবল লৌকিক কামসুখ ভোগের অতৃপ্ত বাসনায় কাম্যজগতের প্রতি আনুরক্ত থাকা। এখানে 'কাম' অর্থ কাম্যবস্তুর কামনা। এ কামনা দুই প্রকারে হয়ে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে পার্থিব বস্তু কামনা। সেই পার্থিব বস্তু কামনা কি ? যেমন : প্রায়ই শোনা যায় – "ধনং দেহি, ভাগ্যং দেহি, যশং দেহি, পুত্রং দেহি" অর্থাৎ ধন দাও, ভাগ্য দাও, যশ দাও, পুত্র দাও ইত্যাদি এরূপে কেবল দাও দাও শব্দে জীবজগৎ অতৃপ্ত বাসনায় ভোগ্যবস্তুর পিছনে ধাবিত হচ্ছে, আর যতই পাচ্ছি পাবার প্রবৃত্তি ততই অসীমরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাসনার সীমাও নেই তৃপ্তিও নেই। ইহজগতে বর্তমান লৌকিক সুখ কামনায় ইহা কাম্যবস্তুর প্রতি ঐকান্তিক লোভ বা আকুল তৃষ্ণা। এরূপে বাসনায় জর্জরিত প্রাণীগণ লোভ, দ্বেষ ও মোহবশে অবিরত অকুশলই (পাপই) সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভবসুখ কামনা। সেই ভবসুখ কামনা কি ? যেমন : মনুষ্য মনুষ্য লোকে সুখ, দেব লোকে দেবসুখ এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসুখ–এই ত্রিবিধ ভব সুখৈশ্বর্যের কথা জেনে বা শুনে তা প্রাপ্তির জন্য মানবকুল লালায়িত হয়। এ ত্রিবিধ ভবসুখের মধ্যে যেই মানব যেই সুখের আকাঙ্ক্ষিত হয়ে অভিরমিত হয় সেই ব্যাক্তি সেই সুখভূমিতে উৎপন্ন হবার জন্য তদ্ভাবত্দগত চিত্ত হয়ে অনুরূপ প্রার্থনার সাথে দান, শীল ও ভাবনাদি কার্য সম্পাদন করতে থাকে। অতএব সেই কর্মানুযায়ী সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সেই মনোজ্ঞ ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে তদ্স্থানীয় সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ইহাও ভবান্তরে পুনঃ জন্ম বা উৎপন্ন হবার অবিচ্ছেদ্য অনুরাগ বা লোভ। এতাদৃশ বাসনায় জর্জরিত প্রাণীগণ লোভ ও মোহবশে ভবান্ধ হয়ে অকুশল ও লৌকিক সুখের উভয়েরই সৃষ্টি করে । সুতরাং এ দু'টি নীতিই লৌকিক সুখের অন্তর্গত সুখের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু ভবোৎপত্তি নিত্য নয়, ক্ষয়-ব্যয় বা মৃত্যুর অধীন বলে উক্ত নীতিদ্বয়ের সুখ আর ভোগ্যবস্তুও পরিবর্তনশীল ও পরিণামী। তদ্ধেতু নির্বাণ ধর্মের উপদেষ্টা মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ এ দু'টি নীতিকে আর্য্য পরিপন্থী গ্রাম্য (হীন)

Dhaka University Institutional Repository

জনোচিত কামভোগ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এ প্রকার লৌকিক কামসুখভোগীকে সাধারণ কথায় জঙ্গলী জীবের সাথে তুলনা করা চলে। সাধারণত দেখা যায় পশুকুল যেমন আহার, মৈথুন, নিদ্রা ও ভয়-এ চার প্রকার চিন্তায় মগ্ন থাকে অন্য কিছু জানে না। লৌকিক কাম্যভোগী ব্যক্তিও ঐরূপ কামভোগের চিন্তায় প্রমত্ত থাকে। এ প্রকার কামসুখ কখনো কোন অবস্থায় সুখের কারণ হতে পারে না। এটা পুনঃপুন জন্মদুঃখের কারণ। তাতে মুক্তি নেই। এখানে মুক্তির পথ লোকোত্তর বিদর্শন পথ যা আধ্যাত্মিক গবেষণারূপ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম-এ ত্রিলক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায়।[৬]

আখর

পদ বা পদাংশের অর্ন্তগত মূলভাব শ্রোতাদেরকে বোঝানোর জন্য কীর্তনীয়া মূল কীর্তনগান নামিয়ে স্বর ও তালের সমন্বয়ে রসময় শ্রুতিময় যে সব উক্তি করেন তার নাম 'আখর'। অন্যভাবে বললে বলা যায়, কীর্তন গানে মাধুর্যের জন্য সংযোজিত অতিরিক্ত পদের নামই 'আখর'।[৭] 'সংগীত কোষ' নামক গ্রন্থে আখর সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে ; কীর্তন পরিবেশনকালে রসময় অঙ্গের অন্যনাম হচ্ছে 'আখর'। কীর্তনের পদবাহিতভাবকে কীর্তনীয়া তার রচিত কথার সাহায্যে মূর্ত করে তুললে আখর হয়। আখর রচনাকে সেজন্য পদের ব্যঞ্জনা প্রকাশক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। পদ গাইবার স্থানে কীর্তনীয়া স্থানে স্থানে পদবাহিত ভাবকে অবলম্বন করে স্বয়ং কাব্য ও ছন্দে কিছু রচনা করে গেয়ে শোনান। তারই নাম আখর।[৮] কীর্তনে আখরের ভূমিকা অন্যান্য সবঅঙ্গের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনুমান করা হয়, কীর্তনে আখর দেওয়ার প্রথা এসেছে হিন্দুস্থানী ঠুংরী ও ভজন গানের প্রভাবে। ঠুংরি ও ভজন গানে মাঝে মাঝে মূল গান হতে সরে এসে ভাব ব্যঞ্জনাময় দু-এক পদ গাওয়ার রীতি ছিল। এটাকে বলা হয় – 'আখেরি'।[৯] এখানে 'আখেরি' শব্দটি আরবী। এই আখেরি শব্দটি ফার্সীতে আখর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই আখরের অর্থ 'অপর' 'পৃথক' কিংবা 'পরবর্তী'। 'প্রসারিত' অর্থে প্রায় কীর্তনে এ 'আখর' পরিবেশন করা হয়। 'আখর' ছাড়া কীর্তন কখনো কেউ ভাবতে পারে না। 'কথা', 'তুক', এবং 'ছুট' এর চেয়ে কীর্তনে আখরের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। আখরের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

আখর পদাবলী সাহিত্যের অর্ন্তনিহিত রসভাণ্ডারের কুলুপ খুলিখার কঞ্চিকা। আখরকে পদের ব্যাখ্যা বললে আসল কথাটাই যেন বলা হয় না। পদে যা বলা হয় নাই অনেক সময় আখরে তাহা প্রকাশ পায়। সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলতে পারি।[১০]

বৌদ্ধ কীর্তনে ব্যবহৃত কিছু আখরের উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

ক. পুনর্জন্মে দিয়ে বান লভিয়াছি বুদ্ধ জ্ঞান
সংস্কার বিনষ্ট মমসহ অনুশয়
সর্বতৃষ্ণা পরিহরি বুদ্ধ নাম আমি ধরি
পুনর্জন্ম ভবে মোর হইয়াছে ক্ষয়।[১১]

খ. দেবব্রহ্মার অজ্ঞাত কল্পনার বর্হিভূত
হেন সম্বোধি লাভে হই প্রীতমন
লৌকিকতা অর্ন্তহিত নির্বাণ সম্যক জ্ঞাত
বন্ধু বলে মোরে করো না সম্বোধন।[১২]

গ. কিবা প্রয়োজন রাজ সিংহাসন
কাঞ্চনে রঞ্জিত বাড়ী
মরণের কালে যাব সব ফেলে
মণি মুক্তা টাকা কড়ি।[১৩]

ঘ. সোনার বরণ সন্ন্যাস দহন
কর কি কারণ বল না মোরে।
কেন অকারণ দেহ নিপীড়ণ
করিতেছ কেন কিসের তরে।[১৪]

মূলত 'আখর' হচ্ছে কীর্তনকে শ্রুতিময়ী শ্রবণীয় সর্বোপরি আকর্ষণীয় করে তোলার এক অভিনব পদ্ধতি বিশেষ। আখর কীর্তনীয়ার গভীর চিন্তার অন্যতম ফসল স্বরূপ। কীর্তনে পরিবেশিত হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

এমন অনেক বাক্য আখরে বলা হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ আখরকে কীর্তনের কথার তান বলে অভিহিত করেছেন।[১৫] অন্যভাবে বললে বলা যায়, মূলপদের ভাবের পরিপূরকরূপ শ্রোতাদেরকে তার ভাবগ্রহণের আস্বাদন ও অনুভব করার পক্ষে সহায়তা করে।[১৬] কীর্তনীয়া নিজে নিজেই আখর সৃষ্টি করে দোঁহারী ও বাদকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সুর বসিয়ে দেন। গুরুর তৈরি আখর শিষ্যরা পরিবেশন করে। আখর গুরু-শিষ্য পরম্পরা চলতে থাকে অবিরত।

তুক

'তুক' এর প্রচলনও দেখা যায় কীর্তনে। বিশেষ বিশেষ পদের মাঝখানে অন্যান্য কীর্তনের মতো বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনেও 'তুক' গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। 'তুক' অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক একরকমের গান। 'তুক' আবার কীর্তনে 'তুক্ক' নামেও সমধিক পরিচিত। 'তুক' অর্থ পদের অংশ। গীত প্রবন্ধের বা গীতের অংশ বিশেষকে 'তুক' বলা হয়। পূর্বে ধাতু বলতে যা বোঝানো হতো বর্তমানে 'তুক' বলতে তাই বোঝায়।[১৭] সাধারণত দুই চরণে একটি 'তুক' গঠিত হয়।[১৮] প্রায়শ একটি পদের অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্যদের অংশবিশেষ নিয়ে যে বাক্যদ্বয় গঠিত হয় তাই 'তুক'। কোন কোন বিশেষ বিশেষ গানে 'তুক' গাওয়া প্রচলন রয়েছে। বুদ্ধ তপস্বীগণের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে তাদেরকে বললেন ; হে তপস্বিবৃন্দ ! তথাগত বুদ্ধ প্রাচুর্যের মহাব্রতও তিনি ত্যাগ করেননি। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। তিনি কেবল দেহক্ষয়কারী আত্মনিগ্রহ সাধনার নিষ্ফল কঠোর সাধন নীতিকেই অর্থাৎ সাধনায় বিঘ্নজনক কৃচ্ছ সাধনকেই ত্যাগ করেছেন। এটা কেবল সাধনা পূর্ণ করার জন্য তিনি করেছিলেন। তার পরপরই কীর্তনীয়া 'তুক' ধরলেন ;

সাধনার ভ্রান্তপথ দিয়ে বির্সজন
দেহ মনের সুস্থতা করেন রক্ষণ[১৯]।

তখন দেবগণ জানতে চাইলে, কোন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন ; কোন ভাগ্যবতীকে তিনি জগৎ জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উত্তরে বোধিসত্ত্বের কথা তুকাকারে কীর্তনীয়া বললেন ;

Dhaka University Institutional Repository

ক. বুদ্ধরূপ প্রকাশিতে ভুতলে গমন
হইয়াছে উপযুক্ত সময় তখন।[২০]

এরূপে পঞ্চশিষ্যসহ ভ্রমণ করে গয়াধামের নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুলিম্ব নামক গ্রামে এসে উপানীত হলেন এবং সাধনার উপযুক্ত জায়গা মনোনীত করে মনোহর বোধিতরুমূলে বসে নিজে শরীর ও অবস্থানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে তুক হলো

খ. নৈরঞ্জনা নদীকুলে বৃক্ষ মনোহর
তারি তলে বসিলেন সিদ্ধার্থ সুন্দর[২১]

গ. মগধ নগরে সুখে রাজত্ব করে
বিম্বিসার নামে রাজা
সদা সুশাসনে সন্তুষ্ট বচনে
পালন করিত প্রজা।[২২]

জয়সেনের রোদনের শব্দ শুনে জয়দত্তের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে ঘুম জড়ানো চোখে জয়সেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো। দাদা ! তুমি কাঁছছো কেন ? এর কারণই বা-কী ? জয়সেন তখন কান্না জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিলেন। এ উত্তরটিকে কীর্তনীয়া 'তুক' পরিবেশন করলেন এভাবে ;

ঘ. তুই আছিস ঘুমিয়ে ভাইরে আমি আছি বসি
মাতা পিতার বিচ্ছেদ দুঃখে বান জলে ভাসি।[২৩]

'তুক' অনেক সময় দীর্ঘ প্রকৃতিরও হয়। মার বিজয়[২৪] হতে 'তুক' এর আরেকটা দীর্ঘ উদাহরণ নিম্নরূপ ; কঠোর কৃচ্ছ সাধনের ফলে সিদ্ধার্থের দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে, দৈহিক দুর্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে কীর্তনীয়া তুক গাইলেন ;

সিদ্ধার্থের তপস্যানল জ্বলিয়া উঠিল
নয়নপথে সেই বহ্নি ছুটিতে লাগিল।

Dhaka University Institutional Repository

মুর্হূতেই দুষ্টকাম ভস্ম হয়ে গেল
পঞ্চ ষোড়শীসহ রতি পলাইল।
সেই বহ্নি সংবরিত হইল তখন
অদূরে দেখতে পেল মৃত্যু বিভীষণ।
শরীর কঙ্কালসার জিহ্বা লেলিহান
সিদ্ধার্থে গ্রাসিতে এল বিস্তারি বদন।
লক্ লক্ জিহ্বা লেলিহান
ভীষণ মূর্তি অদ্ভুত দর্শন
বিস্তারি বদন, গ্রাসিতে আসিলে
কেন বন্ধু, কহ মোরে কেবা তুমি ?
মৃত্যু নাম মম। আসন্ন সময় তব
তব দেহোপরি পূর্ণ অধিকার এবে
বর্ত্তিয়াছে মম, আসিয়াছি তাই।
নিয়ে যেতে তোমারে এখন আমার ভবনে
তোমার দোকান পাট উঠিল এ ভবে
তব ইষ্টদেবে করগো স্মরণ, যদি।
ইচ্ছা কর জন্মের তরে শেষবার।
না হয় সময় তব হইবে না আর
সিদ্ধার্থ সেই ভীষণ মূর্তিকে সম্বোধন করে বললেন
ও ! চিনিয়াছি পাপাময় তব
নাম মৃত্যু হয়, বুঝিয়াছি, কেন তুমি
এ সময়ে আসিয়াছ, এই বেশে
দেখা দিতে মোরে। যোগ বলে
করে জয় তোমারে নিশ্চয়, বিখ্যাত
হইব ভবে নামে মৃত্যুঞ্জয়
মৃত্যু ঘোর বজ্রনাদে তখন কহিল।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধত সন্ন্যাসী ! শুনেছে কি কেউ
এই মর্ত্যপুরী মাঝে, মৃত্যু হস্ত হতে
কেউ কভু পেয়েছে নিস্তার ?
এই মর্ত্যধাম পূর্ণ মম কর কবলিত।
নগণ্য মানব, ব্রহ্মাণ্ড বিজয় আমি,
ভাবিয়াছ মোর হস্ত হতে পাইবে
নিস্তার ! অসম্ভব ! অসম্ভব,
আসিব দুদিন পরে গ্রাসিতে তোমায়।
রোষ কষায়িত আঁখি, নিক্ষেপি
আমার পানে বলে গেল ঘোর
বজ্রনাদে, আসিবে দু'দিন পরে
গ্রাসিতে আমায়। কি করিব
মৃত্যু যদি আসে পুনরায় ?
এ হেন কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ দেহ,
আর কতদিন হায় রহিবে টিকিয়া
সাধিতে সংকল্প মোর কতই করিনু
হইল না বুঝি মোর উদ্দেশ্য সাধন।

ছুট

মূলত গাইবার বা বাজাবার সময় এক গ্রামের একটি স্বর অন্যগ্রামের সে-ই স্বরকে মধ্যবর্তী অন্যকোন স্বর স্পর্শ না করে উচ্চারণ করা বা বাজানোকে ছুট বলা হয়[২৫]। বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনে একধরনের হালকা গানের নাম হলো 'ছুট'। কীর্তনীয়া ভারীগান করতে করতে অনেক সময় সহজ-তরল ভাবে একই গান করে। এ রকমের গান অতি অবশ্যই তরল তাল সমৃদ্ধ। তরলতালে এরকম গান গাওয়া হয় বলেই এটাকে 'ছুট' বলে। বড় তালের বা গানের মাঝে তাল ফেরতায় ছোট তালের গান 'ছুটগান' নামে অভিহিত।[২৬] ছুটগানের শাব্দিক অর্থ 'অবসর'। ইংরেজিতে

Dhaka University Institutional Repository

এই 'ছুট' Temporary intermission recess. Respite, Leisure exemption, interval.[২৭] এ বিষয়ে আরো উল্লেখ রয়েছে Lasting or intended to last only for a short time. [২৮]

ছুট গান অর্থবোধক হবে এমন কোনরকম কথা নেই। এ রকম গানে তাল-লয় ও ঠিক থাকে না সচরাচর। কীর্তন গানের সঙ্গে ছুট গানের কোন রকম মিল নেই। কখনো কখনো কীর্তনীয়া নিজেই আবার কখনো কখনো দোঁহারীর যে কেউ এই ছুট গান করে।[২৯]

ঝুমুর

কীর্তনের পঞ্চম অঙ্গের নাম হলো 'ঝুমুর'। ঝুমুর একটি সুরের নাম বিশেষ। কিন্তু কীর্তনের আসরে ঝুমুর বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কীর্তনের পালা শেষ করার গীত পদ্ধতির নাম 'ঝুমুর'। ঝুমুরগান লোকসংগীত প্রধান। সে হিসেবে ঝুমুরের ছড়াছড়ি দেখা যায় লোকসংগীতে। ঝুমুর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ; ঝাড়খন্ডী ঢঙ ঝাড়খন্ডের আঞ্চলিক সুরের প্রভাবিত পদাবলী কীর্তন গান। উচ্চাঙ্গ পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে মানভূম সিংভূমের আঞ্চলিক সুর মিশিয়ে গোকুলানন্দ ঝাড়খণ্ডী সুর প্রবর্তন করেছিলেন। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ঝুমুর গান। প্রায় লোক কিছু না কিছু ঝুমুর গাইতে পারে।[৩০] ঝুমুরের অন্য নাম ঝুমরী। এ ঝুমুর গানে বিশেষ সুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে।[৩১]

প্রায়ঃ শৃঙ্গার বহুলা মাধবীক
মধুরা মৃদ
ঐকেব ঝুমুরী লৌকিক বর্ণাদি
নিয়ামাজমি ভা

অর্থাৎ শৃঙ্গার রস বহুল, মধুর জাত সুরার মতো, মধুর ও মৃদু বর্ণাদি নিয়মরহিত সঙ্গীত ঝুমুরী।

ঝুমুর গান এবং কীর্তনে পরিবেশিত ঝুমুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কীর্তনে কীর্তনীয়ার পালা শেষ করার সময় ঝুমুর গাওয়া নিয়ম প্রচলিত আছে। অন্যভাবে বলা যায়, গান শেষে কথা প্রারম্ভের পূর্বেই সচরাচর কীর্তনীয়া যেই

Dhaka University Institutional Repository

সুর মিল বা আখ্যান শেষ করে তাকে ঝুমুর বলা হয়। ঝুমুর ছন্দোবদ্ধগীত যা কীর্তনে পালা রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুরের অন্য রকম আবেদন রয়েছে। এখানে ঝুমুরের মাধ্যমে কীর্তনকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। তাছাড়া এ ঝুমুর গানের মাধ্যমে আগ্রহী কিংবা উৎসাহী দর্শক-শ্রোতাদেরকে কীর্তন অভিমুখী করা হয়। এ সময় দোঁহারীরা উচ্চ মাত্রায় গান ধরে এবং বাদ্য-বাদকেরা অতি উচু স্কেলে তাদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলোকে বাজায়। বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর দুই প্রকার। যেমন : স্বল্প ঝুমুর এবং দীর্ঘ ঝুমুর। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, স্বল্প ঝুমুরের পরপরই দীর্ঘ ঝুমুর পরিবেশিত হয়। নিচে উভয় রকম ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক. মৃদু ঝুমর : প্রেমে জগত জয় করিব [৩২]

মুক্তির পথ দেখাইব ,, ,, ,, ,,

জরা-ব্যাধি ঘুচাইব ,, ,, ,, ,,

জন্ম-মৃত্যু বোধ করিব ,, ,, ,, ,,

দীর্ঘ ঝুমুর : নির্বাণ সুধা বিলাইব প্রেমে জগৎ ভাসাইব (২ বার)।

হা-হা-রে ... ... হে-হে-হে, হা-হা-হা .. ..

মৃদু ঝুমর : সেই দামামা আজও বাজে[৩৩]

কোটি কোটি হৃদি মাঝে ,, ,, ,, ,,

চীন, জাপান, লঙ্কাধামে ,, ,, ,, ,,

তিব্বত, বার্মা, শ্যামে ,, ,, ,, ,,

নেপাল, ভূটান, সিকিমিতে ,, ,, ,, ,,

ধরাধামে দেশে দেশে ,, ,, ,, ,,

গয়াধামে উরুবেলায় ,, ,, ,, ,,

শ্রাবস্তীর জেতবনে ,, ,, ,, ,,

দীর্ঘ ঝুমুর : লুম্বিনীর তরুলতা আজো গাহে বুদ্ধকথা (২ বার)।

হা-হা-রে ... ... হে-হে-হে, হা-হা-হা .. ..

Dhaka University Institutional Repository

গ. মৃদু ঝুমর : অশান্তি আগুন জ্বলে[৩৪]

ঝগড়া ঝাটি পরস্পরে ,, ,, ,,

পর হয়ে যায় রে

পিতা পুত্রে জন্ম তরে ,, ,, ,, ,,

ভ্রাতা ভ্রাতা দ্বন্দ্ব করে ,, ,, ,, ,,

দীর্ঘ ঝুমর : কাল সাপিনী আনি ঘরে, ঘর ভাঙ্গি যায় একে বারে (২বার)।

হা-হা-রে ... . হে- হে- হা-হা-হা ... ...

ঘ. মৃদু ঝুমর : জালি বলে নাম রাখিল[৩৫]

বেশ্বান্তরের পুত্র হলো ,, ,, ,, ,,

দুঃখ দৈন্য দূর হলো ,, ,, ,, ,,

মহানন্দ উদয় হলো ,, ,, ,, ,,

দীর্ঘ ঝুমুর : বেশ্বান্তরের পুত্র হলো জালি বলে (২বার)।

হা-হা-রে .... হে-হে-হে, হা-হা-হা ... .

ঙ. মৃদু ঝুমর : এই যে দুঃখ হে[৩৬]

জন্ম জরা ব্যাধি মরণ ,, ,, ,, ,,

প্রিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে ,, ,, ,, ,,

অপ্রিয়ের মিলন ঘটে ,, ,, ,, ,,

যা চায় তা পায় না ,, ,, ,, ,,

দীর্ঘ ঝুমুর : পক্ষস্কন্ধের[৩৭] সম্মেলনে এই যে দুঃখ হে।

হা-হা-রে ... . হে-হে-হে, হা-হা-হা ... .

চ. মৃদু ঝুমর : সবে সুখে ছিলরে[৩৮]

চম্পক নগরের মাঝে ,, ,, ,,

সম্ভু রাজার সুশাসনে ,, ,, ,,

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভু রাজার সুশাসনের ধর্মে রাজার ছিল মতি
সম্ভু রাজার সুশাসনে কভু করে না কারো ক্ষতি
দীর্ঘ ঝুমুর : কভু করে না কারো ক্ষতি, ধর্মে রাজার ছিল মতি (২বার)।
হা-হা-রে ... ... হে-হে-হে, হা-হা-হা ... ...

বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর গান

বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর গান গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। বাংলা লোকসংগীতির একটি বিশিষ্ট ধারার নাম ঝুমুর। মূলত আদিবাসী সংগীত হলেও সাঁওতালদের মাধ্যমে ঝুমুর বাংলাগানের অর্ন্তগত হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সীমান্তে বা তার ভিতরে সাঁওতালদের সঙ্গে বাংলা লোকসংস্কৃতির সংযোগ ঘটলে ঝুমুরের ধারা বাংলা লোকসংগীতিতে প্রচলিত হয়। ক্রমে বাংলা ঝুমুরের ধারায় বেশ পরিবর্তন আসে[৩৯]। কিন্তু বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর গানের অন্য একটি দিক পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর গান 'কথা' শেষ করার পরপরই পরিবেশন করেন । কীর্তনীয়া সচরাচর ঝুমুর গানের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদেরকে তত্ত্ব-তাত্ত্বিক কিংবা ইতিহাসের গভীর বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। বৌদ্ধ কীর্তনে ঝুমুর গানের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. বুদ্ধরূপে প্রকাশিতে ভূতলে গমন,
হইয়াছে উপযুক্ত সময় এখন।
চারি মুখ্য বিষয় আমি করেছি চিন্তন,
দেশ জাতি বংশ মাতা করেছি মনন।

জম্বুদ্বীপে জন্ম নিল পূর্ব বুদ্ধগণ,
আমি জন্মিব তথা চিন্তিলাম এখন।
বৈশ্য শূদ্র কুলে নাহি জন্মে বুদ্ধগণ,
যাইব ক্ষত্রিয় কুলে করিলাম মনন।

নিষ্কলঙ্ক শাক্যবংশ কপিল নগরে,
জন্ম লভিব আমি গিয়ে মর্ত্যপুরে।

Dhaka University Institutional Repository

পতিব্রতা পুণ্যশালী দেবী মায়ারাণী,
শুদ্ধোদনের প্রিয়তমা আমার জননী।[৪০]

২. ঘুমে মায়ারাণী দেখেন অদ্ভুত স্বপন,
এখন সেই স্বপ্ন বিবরণ করি নিবেদন।
স্বর্গ হতে চারিজন দেবতা আসিল,
সপ্তবার রাণী মায়ে প্রদক্ষিণ করিল।

তারপরে পালঙ্ক তার কাঁধে উঠাইয়া,
হিমালয়ে নিয়ে গেল বহন করিয়া।
হিমালয়ের শৃঙ্গদেশে পালঙ্ক রাখিল,
দেবীগণ এসে মায়ার স্নান করাইল।

পার্থিবতা চলে গেল স্বর্গীয় পরশে,
রাণীর জঠরে এক বিদ্যুৎ প্রবেশে।
এমন সময়ে এক অদ্ভূত বারণ,
শুঙে লয়ে শ্বেত পদ্মে করে আগমণ।
মায়ার দক্ষিণ কুক্ষি বিদারণ করি,
রাণীর জঠর মাঝে প্রবেশিল করী।[৪১]

৩. বোধিসত্ত্বের মহাপ্রভা সহিতে নারিল,
সপ্তদিনে মহারাণী পঞ্চত্ব পাইল।
অকস্মাৎ থেকে গেল সংগীত মূর্চ্ছনা,
রঙ্গালয়ে বন্ধ হল মধুর বাজনা।

কপিল পুরে পড়ে গেল হাহাকার ধ্বনি,
শুদ্ধোদনের মুখে শুধু কোথায় গেল রাণী।
এ অনাথ শিশু রাখি বল মোরে দিয়া ফাঁকি,

Dhaka University Institutional Repository

কেন প্রিয়ে তা দিলে আমায়।

এ রাজ্য ধন জন সবই হল অকারণ
তোমার বিহণে প্রাণ যায়।
রাজপুরী পরিহরি বাজল শ্রী গেল ছাড়ি,
এখন আমি করি কি উপায়।

সদ্যজাত শিশুটিরে কারে তুমি দিয়ে গেলে,
বল কি করিব আমি হায় হায় হায়।
এমন সুখের দিনে কোথা চলে গেলে,
অকুল সাগরে মোরে ভাসাইয়া দিলে।

কে পুষিবে তোমার এই দুধের সন্তান,
তোমার বিহনে প্রিয়ে রাজপুরী শ্মশান।
পুত্রমুখ হেরিবারে কতই সাধন,
সপ্তদিনে হল কিরে অভিলাষ পুরণ।[৪২]

৪. সর্ব অর্থ সিদ্ধ তাই শিশু কৃত আর্য,
তারি উপযুক্ত নাম রাখিও সিদ্ধার্থ।
গৌতমী পালিত তাই গৌতম নামে,
হবে খ্যাত এই শিশু এই ধরাধামে।

মঙ্গলার্থে আগত তাই হইবে সুগত,
যথাকালে আগত তাই হবে তথাগত।
শাক্যকুলে জন্ম বলে হবে শাক্য মুনি,
এই শিশু বুদ্ধ হবে মহাজ্ঞানী।

এই সঙ্গে গণকগণ রাজাকে সতর্ক করে দিয়ে কথার মাধ্যমে বললেন।

Dhaka University Institutional Repository

কখনও এই শিশু ঘরে না রহিবে,
রোগী- বৃদ্ধ- মৃত- ঋষি যেদিন হেরিবে।
জরাজীর্ণ রুগ্ন মৃত ঋষি সেই দিন,
নিরখিবে শিশু গৃহ ছাড়িবে সেদিন।
নিশ্চয়ই হবেন বুদ্ধ করিবে মোচন,
পৃথিবীর পাপ তাপ মোহ আবরণ।[৪৩]

৫. আমি রাঁধুনি হইব ব্যঞ্জন বাটিব,
হাঁড়ি না ছুইব তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিব,
কেশ না ভিজিবে তায়।

পাকাল হইব পঙ্কেতে রহিব,
পঙ্ক না মাখিব গায়।
পঙ্কজ হইব জগত মোহিব,
অপরূপ মহিমায়।

গৃহী হয়ে লোকে ধর্ম পালে কি প্রকারে,
আমার জীবনে তাহা দেখাব সবারে।
পতিব্রতা সতী সাধ্বী পত্নী থাকে যার,
এ সংসারে তার মত সুখী কেবা আর।

সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী রহে অনুক্ষণ,
পতির বিরহে সতী হারায় জীবন।
এ সিদ্ধান্ত স্থির করি কুমার তখন,
কন্যাগুণ গাথা ভূপে করিল অর্পণ।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

৬. কামনার দাবানলে দিবানিশি মন জ্বলে,
বুঝিলাম এতদিনে অনিত্য সংসার।
এ সংসারে আর কিছু নাই সার,
নানা পাখী আসি বৃক্ষে সাঁঝের বেলায়,
সকাল বেলা নেই পাখি কোথায় উড়ে যায়।

মাতাপিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন,
পথিকে পথিকে যেন পথের আলাপন।
এই যে টাকা এই যে কড়ি এই যে দালান কোঠা বাড়ি,
কিছুই যাবে না সঙ্গে, যেদিন যাবি যমের বাড়ি ।

এই যে ছেলে এই যে মেয়ে এই যে সাধের বউ,
যাবার বেলা সাথের সাথী হবে নারে কেউ।
সে দিনের তুই জন্মের মত ভবে বিদায় হবি,
লোহার সিন্ধুকের চাবি কারে দিয়ে যাবি ?
টাকা পয়সা ধন দৌলত সব রবে পড়িয়া,
ন্যাংটা এসে ন্যাংটা যাবি পথের কাঙ্গাল হইয়া।[৪৫]

এই দুনিয়া গোলক ধাঁধাঁ ভাই
মায়ায় বাঁধা ত্রিসংসার,
মুদলে আঁখি সকল হবে ফাঁকি
ভবের খেলা অন্ধকার।

আতর গোলাপ সাবান মেখে,
শরীর রাখ পরিষ্কার।
মাটির দেহ মাটি হবে ভাই,
শৃগাল কুকুরের হবে আহার।

Dhaka University Institutional Repository

আজ যে সন্তানে দিচ্ছ তুলে,
তোমার মুখের সাধের আহার।
কাল সে তোমার সেই মুখেতে,
আগুন দিয়ে শোধবেরে ধার।

কেবা পিতা কেবা মাতা,
ভাই বন্ধু কেবা কার।
ন্যাংটা এসে ন্যাংটা যাবি
সঙ্গে সাথী নাই তোমার।[৪৬]

৮. পাখা লভি উই পোকা অহংকার করে,
আগুন নিভাতে গিয়ে নিজে জ্বলি মরে।
বুদ্ধিহীন মশা মরে মাকর জালে বসে,
বিপদে পড়িয়া লোকে মরে বুদ্ধি দোষে।

অতি লোভে মরে ফড়িং খেজুর রসে পড়ে
মুর্খ লোকে মরে সেরূপ লোভের ফাঁদে পড়ে।
অবোধ শিশু প্রাণটি হারায় নামে যদি জ'লে।
আধার গাথা বয়শী মাছে খাদ্য জ্ঞানে গিলে।[৪৭]

৯. পর দুঃখ এই সংসারে ক'জনে বা বুঝে,
পর দুঃখে সুখী হয়ে ঠাট্টা মারি হাসে।
কেহ কারে ঐ সংসারে অপদস্থ করি,
বাহু আস্ফালনে করে লয় বাহাদুরী।

দুষ্ট দুরাচারী যদি হয় ধনবান,
স্বার্থবাদী লোকে করে তার জয়গান।
ভাইয়ে ভাইয়ে কোন কালে যদি দ্বন্দ্ব ঘটে,

Dhaka University Institutional Repository

ঝগড়া ঝাটির ইন্ধন যোগায় দুষ্ট লোকে জুটে।
ধুর্ত প্রবঞ্চক শট, চোর দস্যুগণ,
পর ধন হরণে রত থাকে সর্বক্ষণ।[৪৮]

১০. পাপচারী অধার্মিক ভাবে এই সংসার,
চিরদিন রবে তার সুখের সংসার।
শক্তি লভি শক্তির জোরে ন্যায় পথ হারায়,
পাথরে আঘাতে আঘাত নিজে কষ্ট পায়।

অগ্নি যদি ধরে কভু হস্ত যায় পোড়ে,
ভীমরুল চাকে ঢিল মারে ভীমরুলে কামড়ে।
যে যেমন কর্ম করে এ ভব সংসারে,
তেমনি কর্মের ফল ভোগিতে হয় তারে।[৪৯]

১১. যেমন এক চন্দ্র আলো করে জগত সংসার,
লক্ষ লক্ষ তারা দেখ না হবে আঁধার।
সৎ পুত্র এক জনেতে বংশ উজ্জ্বল হয়,
কুপুত্র হলে বংশের চরম ক্ষতি হয় ।

কোন ছেলে পিতার সঞ্চিত ধন বসে বসে খায়,
কোন ছেলে পিতার সঞ্চিত ধন পত্নীরে সাজায়।
সব ধন ফুরাইলে পত্নীর লাথি খায়,
রাস্তা ঘাটে কাঁদে আর করে হায় হায়।[৫০]

১২. ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ফল জানতে পেরেছি,
ধ্যান বলে কামনার অতীত হয়েছি।
ভোগক্ষমে ইন্দ্রিয়েরা অসংযত হলে
স্বীয় শক্তি প্রকাশিবে সুযোগ পাইলে।

Dhaka University Institutional Repository

এই শরীরে যতদিন কাম তৃষ্ণা রবে,
বিশুদ্ধ নির্বাণ লাভ কভু না হইবে।
কঠোর তপস্যা এলে দেহ মন পোড়াব,
অলৌকিক শক্তি আমি তাহলে পাইব।

শুষ্ক দেহে শুষ্ক মন করি যদি সংঘর্ষণ,
তবে বুঝি জ্ঞান অগ্নি পাব দরশন।[৫১]

১৩. সৌন্দর্য ঐশ্বর্য, যশ, যাহা চাহ দিব,
গৌরব বিলাস তোমার কণ্ঠে পরাইব।
অধরে ফুলের হাসি দেখ কি সুন্দর,
ফুল ধনু ফুল তূণ ফুল পঞ্চশর।

সংসার সুখের কাণ্ড সুধারসে ভরা,
অফুরন্ত ভালবাসা শান্তির ফোয়ারা।
যোগে কেন পচাইবে সোনার বরণ,
নরে কি লভিতে পারে অসাধ্য নির্বাণ।

অসম্ভব আশা যোগী কর পরিহার
মানবের সাধ্য নহে মানব উদ্ধার।[৫২]

১৪. ভবচক্র হতে মুক্তি পেতে হলে,
কর সবে মুক্তি সাধনা।
অপ্রমত্ত হয়ে রক্ষা কর শীল,
কর ত্রিরত্ন উপাসনা।

লোভ-দ্বেষ মোহ করিয়ে বর্জন,
কুশল কর্ম কর সমাপন।

Dhaka University Institutional Repository

মুছে যাবে সব মনের কালিমা,
ঘুচিবে অন্তিম যাতনা।

তাই বলি মন হও সচেতন,
অষ্টাঙ্গিক মার্গে কর বিচরণ।
অবিদ্যার মোহ ধ্বংস কর সব,
পুরাতে মনের বাসনা।[৫৩]

ঝুমুর গান একটি অর্থবোধক গানের সমাহার। এ গানের মাধ্যমে দর্শক নিজে নিজেই জীবন জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করত পারে। অন্যান্য গানের মতো বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তনে ব্যবহৃত ঝুমুর গানও সুরালা কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। ঝুমুর অনেকটা ছুটা কীর্তনের মতো। সুরের মাধ্যমেই এই রকম গান ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করে। তবে কিছু কিছু ঝুমুর গান অনেক বড়। এ রকম ঝুমুর গানে দর্শক শ্রোতা বিরক্তবোধ করে না কখনো। এ ঝুমুর গান পরিবেশন কালে কীর্তনীয়া এ গানকে রসময় করে পরিবেশন করার চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যউৎস

১. তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। একাদিক্রমে তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সংগীতজ্ঞ এবং স্বভাব কবি। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অর্ন্তগত পাহাড়তলী নামক গ্রামে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এ মহান ব্যক্তি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যে ক'জন ব্যক্তি বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তন রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন তাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বুদ্ধ সন্ন্যাস, অবতার লীলা, সিদ্ধার্থের জন্ম ও বাল্যলীলা, মারবিজয় ইত্যাদি গ্রন্থ কীর্তনাকারে রচনা করেছিলেন তিনি।

২. হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দশম অবতারের মধ্যে বুদ্ধ নবম অবতার। হিন্দু পালা কীর্তনের প্রভাবেই এখানে বুদ্ধকে একজন অবতার হিসেবে দেখোনো হয়েছে। আসলে তিনি অবতার ছিলেন না, একজন মানুষ ছিলেন। যিনি মহামানব নামেই সমধিক পরিচিত।

৩. পদাবলী কীর্তনের ঐতিহ্য থেকে সৃষ্ট একপ্রকার গান। কীর্তনের বহু বৈশিষ্ট্য ঢপকীর্তনে করা হয়নি। কীর্তনের মতো আখরের ব্যবহার তেমন নেই ঢপ কীতনে। 'ঢপ' কীর্তনের পদ অনুপ্রাসবহুল। 'ঢপ' কীর্তন অনেকটা প্রায় গীতিনাট্যের ন্যায় পরিবেশিত হতো। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র পোষাক পরিধান কীর্তনাকারে পরিবেশন পদ্ধতিই ছিল 'ঢপকীর্তন'।

৪. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, কীতর্ন পদাবলী (কলকাতা, ১৩৪৫), পৃ. ৪১

৫. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, মার বিজয় (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, ১৯৯৬), পৃ. ১১-১৩

৬. শান্তরক্ষিত স্থবির, ধর্মচক্র প্রর্বতন সূত্র কীর্তন (রেঙ্গুন, ১৯৬০), পৃ. ৩০-৩২

৭. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ .৫০-৫২

৮. করুণাময় গোস্বামী, সংগীতকোষ (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ১৮

৯. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯০৯), পৃ. ১৯৬

১০. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া (কলকাতা, ১৯৭০), পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

১১. শান্তরক্ষিত স্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৩. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, সদ্ভূমিত্র (চট্টগ্রাম, ১৯৮৭), পৃ. ৯

১৪. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, পূর্বোক্ত,পৃ. ১০৭

১৬. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারতবর্ষ (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ৪০৭

১৭. করুণাময় গোস্বামী, ঐ, পৃ. ২৭৪

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

১৯. শান্তরক্ষিত স্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২০. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, বুদ্ধ সন্ন্যাস (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬), পৃ. ২২

২১. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২২. সন্তোষ বড়ুয়া, অজাতশত্রু পিতৃ হত্যা (অপ্রকাশিত) পৃ. ২

২৩. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

২৪. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

২৫. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

২৬. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৭. Bangla Academy Begali English Dictionary(Dhaka, 1994), p. 212

২৮. Solly Wehmeir Edited, Oxford Advanced Learner's Dictionary (New Delhi ,2002) p. 1338

২৯. সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, তরিখ : ২৭.৯.০৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, পূর্বোক্ত,পৃ. ২০৯

৩১. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি (কলিকাতা, ১৯৯৯) পৃ. ১০৭

৩২. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৩৩. ঐ, পৃ. ২৯–৩০

৩৪. প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, সিবলী চরিত (চট্টগ্রাম, ১৩৬৮), পৃ. ৩

৩৫. লেখকের নাম অজ্ঞাত, বেশান্তর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৬

৩৬. শান্তরক্ষিত স্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৩৭. পঞ্চস্কন্ধ : পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে নাম-রূপের প্রবাহ। এ নামরূপকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় পঞ্চস্কন্ধ। যথা :

রূপ : যার রূপ আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ আছে তাই রূপ। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই রূপের অর্ন্তভুক্ত হয়।

বেদনা : ইন্দ্রিয়ানুভূতিই বেদনা। এর ভিত্তিতেই বিশেষবস্তু সম্বন্ধে উপলব্দি জন্মে।

সংজ্ঞা : ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহায্যে যে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপত্তি হয় তাই সংজ্ঞা। এটাকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বলা হয়।

সংস্কার : ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই সংস্কার।

বিজ্ঞান : মননে কর্মই বিজ্ঞান

(গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা, হিরন্ময় বন্দ্যোপধ্যায় এর প্রবন্ধ। ধম্মপদে লিখিত।)

৩৮. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, সম্ভূনিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩৯. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত,পৃ. ২১৮

৪০. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত,পৃ. ২৩

৪১. ঐ, পৃ. ২৪–২৫

Dhaka University Institutional Repository

৪২. ঐ, পৃ. ৩২–৩৩

৪৩. ঐ, পৃ. ৩৪

৪৪. ঐ, পৃ. ৩৯

৪৫. ঐ, পৃ. ৪৬

৪৬. ঐ, পৃ. ৪৮

৪৭. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, সম্ভূমিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৪৮.ঐ, পৃ. ৮

৪৯.ঐ, পৃ. ৪২–৪৩

৫০. সন্তোষ বড়ুয়া, শ্যামাবতী (অপ্রকাশিত) পৃ. ২১

৫১. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৫২. ঐ, পৃ. ১৯

৫৩. ঐ, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ কীর্তনের প্রকারভেদ ও কীর্তনীয়ার পরিচয়

'কীর্তন' বলতে যশোকথা এবং বিভিন্ন রকম গুণাদি কিংবা মহিমার বর্হিপ্রকাশকে বুঝায়। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) কীর্তনকে দু'ভাগে[১] ভাগ করেন। একটির নাম সংকীর্তন এবং অপরটির নাম লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। এখানে নামকীর্তনে ঈশ্বরের নামগান ও করুণার কথাই প্রধান উদ্দেশ্য। লীলাকীর্তনে ঈশ্বরের রূপ, গুণ ও বিবিধ মনোহরী লীলার প্রাধান্য লাভ করে।[২] বৌদ্ধ কীর্তনকে তিন ভাগে[৩] বিভাজন করে দেখা যায়। যথা : ক. নাম কীর্তন, খ. পালা কীর্তন এবং গ. পাল্টা কীর্তন।

১. নামকীর্তন : বুদ্ধ কিংবা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের গুণ-যশ-খ্যাতি বর্ণনা করার মাধ্যমে নামকীর্তন পরিবেশিত হয়।

২. পালাকীর্তন : বুদ্ধ কিংবা তাঁর অতীত জীবনকাহিনী জাতক অবলম্বনে অথবা তাঁর প্রতিভাধর, যশ্বশী খ্যাতিধর শিষ্যর জীবন কাহিনী নিয়ে যে কীর্তনগীত পরিবেশিত হয় তাকেই বলা হয় পালা কীর্তন ।

৩. পাল্টাকীর্তন : পাল্টা কীর্তন বলতে কবিগানের মতো দু'জন কীর্তনীয়ার মধ্যে কীর্তন ও কথার মাধ্যমে পারস্পারিক প্রশ্নোত্তরকে বোঝায়।

এখানে দেখা যায়, নামকীর্তন এবং পালাকীর্তন প্রায় সমগোত্রীয়। পালাগান সর্ম্পকে বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন ; লৌকিককাহিনী (Narrative Poetry) একেকটি পরিচ্ছেদ কিংবা লোকগীতিকার আনুপার্বিক বিষয়টিকে পালা গান বলে।[৪] এদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সংগীতপ্রিয় এক সম্প্রদায় বটে। কীর্তন যেহেতু একটি বৈটকী সংগীত তাই বেশ কয়েকজন হলে গ্রামগঞ্জে কীর্তন গানের আয়োজন করে সমজদার ব্যক্তিরা। এ জনগোষ্ঠীরা যে সমস্ত নামকীর্তন বা পালাকীর্তন পরিবেশন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাগলীলা, অবতারলীলা, তথাগত বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, সিদ্ধার্থের জন্ম ও বাল্যলীলা, বুদ্ধ সন্ন্যাস, বেশ্বান্তর দুস্য

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গুলিমাল, অজাতশত্রু, সীবলী চরিত, শ্যামাবর্তী, ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, ধর্মপদ ও চর্যাপদ সংকীর্তন ইত্যাদি নামোল্লেখযোগ্য। কীর্তন গীতগানের সাথে বেশ কিছু লোকসংগীতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে প্রদান করা হলো।

কীর্তন ও জারী গান

কীর্তনের গীত পরিবেশন পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কীর্তনের পালাগুলো কথা অনুযায়ী সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। এখানে কীর্তনের পূর্বরাগ এবং তদানুযায়ী নিবেদন পদ, তুক, ছুট এবং সর্বশেষে পরিবেশিত হয় ঝুমুর বা মিলনের পদ। যে পালায় ঝুমুর গাওয়া হয়, সে পালায় 'মিলন' গাওয়া হয় না এবং যে পালায় 'মিলন' পরিবেশন করা হয়, সে পালায় আর ঝুমুর পরিবেশিত হয় না।[৫] বৌদ্ধ কীর্তন গানে কীর্তনীয়া বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের স্তুতিমূলক বন্দনা গানের মাধ্যমে আসর শুরু করে। অনুরূপভাবে জারী গানেও প্রথমে শ্রষ্টা, রসুল, সরস্বতী বা ফাতিম ইত্যাদির স্তুতিমূলক বন্দনা গান করে।[৬] বৌদ্ধ কীর্তন একস্থানে একবারের অধিক পরিবেশন হয় না। কিন্তু জারী গান একই জায়গায় দুই, তিন এমন কি চার রাত পযর্ন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

পাল্টা কীর্তন ও কবিগান

ঊনবিংশ শতাব্দী কবিগানের কাল। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কবিগানের আসর প্রধানত কলিকাতা ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতো।[৭] বৌদ্ধ কীর্তনও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রচার প্রসার লাভ করেছিল। এখানে বৌদ্ধ কীর্তনের অতি আকর্ষণীয় একটি গানের নাম হলো পাল্টা কীর্তন। ধারণা করা হয়, পাল্টাগানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এটি। অনেক ক্ষেত্রে পাল্টাগানকে জবাবী গানও বলা হয়।[৮] পাল্টা কীর্তন হচ্ছে কবিগানের মতো কীর্তনীয়াদের তুমুল লড়াই। কবিগানে যেমন দু'টি পক্ষ থাকে তেমনি বৌদ্ধ পাল্টা কীর্তনেও দু'টি পক্ষ থাকে। কবিগানে একজন প্রধান কবিয়াল এবং তাদের নিজ নিজ দোঁহারী থাকে। তেমনি আবার পাল্টা কীর্তন গানেও একজন প্রধান কীর্তনীয়া থাকে এবং উভয়ের আলাদা আলাদা দোঁহারী থাকে। উভয়গানে দুটি আলাদা চরিত্র বা বিষয় নিয়ে গান পরিবেশন করা হয়। উভয় চরিত্র কিংবা বিষয়ের মধ্যে এক ধরণের নিবির সম্পর্ক যেমন থাকে

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি থাকে আবার বৈপরীত্যও। তবে পাল্টাকীর্তনে বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে উপস্থিতি সমজধার দর্শক- শ্রোতা।[৯] অনেক সময় কবিগানেও উপস্থিতি দর্শক-শ্রোতার বিষয়ভিত্তিক গান করার জন্য অনুরোধ জানান। কবিগান এবং পাল্টাকীর্তন এ উভয় গানের আর একটি মূখ্য উদ্দেশ্য আছে আর সেটি হচ্ছে উভয়ের অর্পিত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা। কবিগানের দর্শক-শ্রোতাদের নায় পাল্টা কীর্তনেও বিরাজ করে এক ধরণের টান-টান উষ্ণ উত্তেজনা। এ উত্তেজনায় উজ্জীবিত হয়ে কবিয়াল ও কীর্তনীয়া দু'জনেই নিজেদের নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরতে চায় এবং খন্ডন করতে চায় অপর একজনের উত্থাপিত সকল প্রকার যুক্তি ও তর্ক।

পাল্টা কীর্তন ও কবিগানে দু'জন করিয়াল এবং কীর্তনীয়ার মধ্যে জোটক হয়। জোটক হয়ে তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাক্ যুদ্ধ অর্থাৎ তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয়ে গান করে।[১০] কবিগান রসযুক্ত একটি লোকসংগীত আর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর পাল্টা কীর্তন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্পর্কিত গুরুগম্ভীর পালায় ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। কবিগানের যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াও উপস্থিত জ্ঞান আবশ্যকতা রয়েছে তেমনি আবার বৌদ্ধ কীর্তনীয়ারও তাৎক্ষণিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে কবিগান হয়। যেমন : দূর্গা ও সরস্বতী, রাবণ ও রাম লক্ষণ, মাহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ চন্দ্র বসু ইত্যাদি। বৌদ্ধ পাল্টা কীর্তনও বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিবেশিত হয়। যেমন : সিদ্ধার্থ ও গোপা, বুদ্ধ ও দেবদত্ত, বুদ্ধ ও অঙ্গুলিমাল, বুদ্ধ ও মার, বুদ্ধ ও রাহুল, নাগসেন ও মিলিন্দ, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন, বুদ্ধ ও রাজা শুদ্ধোদন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদি কীর্তনীয়া

শ্রী চৈতনদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) ছিলেন আদি কীর্তনীয়া। কীর্তনগান ভক্তিধর্মের প্রাণপ্রবাহ স্বরূপ। সর্বপ্রধান চৈতন্য পরিকরদের কিংবা পরিষদের মধ্যে অনেক গায়ক বাদক, নর্তক ও কবি ছিলেন। তন্মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ সর্ব প্রধান-চৈতন্য পরিকর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে নবদ্বীপ পর্বের মুকুন্দ দত্ত ও নীলাচল পর্বের স্বরূপ দামোদর, তারপর তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসু দেব। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীর গায়ক। চৈতন্য গোষ্ঠীর সকলেই তার গানে মুগ্ধ হতো।[১১] স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ ও অন্যতম কীর্তনীয়া ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় গায়ক ছিলেন। নিম্নলিখিত উক্তিটিই তার উজ্বল দৃষ্টান্ত বলে প্রতিভাত হয়।

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ
তিন ভাইর কীর্তনে প্রভু সন্তোষ।[১২]

তিন ভাই গান ধরলে নিত্যানন্দ তাদের গানের সাথে সাথে নাচ করতেন।

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিত্যানন্দ।[১৩]

তিন ভাইয়ের মধ্যে আবার মেজ মাধবের যশ-খ্যাতি সবচেয়ে বেশি ছিল। তাই নিত্যানন্দ তার পরম অনুরাগী ছিলেন। চৈতন্য 'ভাগবত' নামক গ্রন্থে মাধবের প্রশংসা করা হয়েছে এ ভাবে ;

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর
তেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।[১৪]

চৈতন্যদেবের অন্য পার্ষদদের মধ্যে গায়ক হিসেবে নাম ছিল শ্রীবাস ও তাঁর ছোট ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত ও তাঁর ছোট ভাই বাসুদেব দত্ত এবং ছোট হরিদাসের। নীলাচলে রথাগ্রে কীর্তনে চৈতন্য দেবের নিজস্ব চারদলের মূলগায়ক ছিলেন মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস ও গোবিন্দ ঘোষ।[১৫] তাছাড়া আরো ভালো কীর্তন করতেন হরিদাস ঠাকুর, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, জগদীশ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বিষ্ণু দাস, শ্রীকান্ত সেন, শুভানন্দ ও গঙ্গাদাস।[১৬] এভাবে বংশ পরম্পরায় কীর্তন চর্চা হয়ে আসছিল। ষোড়শ শতক হতে অষ্টাদশ শতকের যে ক'জন কীর্তনীয়ার নাম পাওয়া গিয়েছে তাদের সবাই অতি উচ্চ বৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। আবার অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কীর্তনীয়ার পাশাপাশি অন্ত ্যজ জাতির গায়ক ও বাদকেরা কীর্তনের ক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অনেক পরিবারে পুরুষানুক্রমে কীর্তন চর্চা হতো। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরের বংশগত প্রতিষ্ঠা ও নিষ্ঠা সুবিদিত। শ্রীখণ্ডের গৌর গুণানন্দ ঠাকুর এবং ময়নাডালের কিশোরী মিত্র ঠাকুর ও রাস বিহারী মিত্র ঠাকুর ছিলেন যশস্বী গায়ক ও সঙ্গীত বিশারদ। পায়ের গামের (বীরভুম) চক্রবর্তী বংশ এবং শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের জ্ঞাতি দক্ষিণ খণ্ডের (বর্ধমান) ঠাকুর বংশেও বেশ কয়েক পুরুষ ধরে কীর্তন চর্চার খ্যাতি ছিল। চক্রবর্তী বংশের মনোহর ও কেশব খ্যাতিমান গায়ক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার যজান ও দক্ষিণখণ্ডের দাসবংশের অনুরাগী দাসী, তাঁর দুই ছেলে রসিক দাস ও গৌর দাস ও রসিক দাসের পুত্র রাধা শ্যামাদাস দৌহিত্র যশোদানন্দ দাস কীর্তন গানে খুব নাম করেছিলেন। চেতুয়া দাসপুর এলাকায় মহবৎপুর গ্রামের মন্ডলবংশে পুরুষানুক্রমিক কীর্তন চর্চার ধারা ছিল।[১৭]

বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনীয়া

চর্যাপদ রচয়িতা নিজেরা পদ রচনা করে সুর দিয়ে গান করতেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পযর্ন্ত এই সমস্ত পদাবলীগুলো রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের পর বিশিষ্ট পদকর্তা জয়দেব ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আত্ম প্রকাশ করেন। তারপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বহু বিশেষ প্রতিভাধর পদকর্তার আর্বিভাব হয়। সর্বশেষ চৈতন্য দেব কীর্তনের মাধ্যমে সবাইকে উজ্জীবিত করে তোলেন। বৌদ্ধদের পতন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তনের ৩০০ বছরের মধ্যে বৌদ্ধ পদাবলী চিরদিনের জন্য (বৌদ্ধ কীর্তনাবলী) হারিয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে আবার এগিয়ে আসলেন সুসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ কীর্তন বিশারদ মোহন চন্দ্র বড়ুয়া। তিনিই প্রথম 'অবতার লীলা' নামক একটি বৌদ্ধ কীর্তনের বই রচনা করেন। কীর্তনের এ বইটি ছাপানো হয়েছিল ১৯২৭ সালের দিকে। তিনি এ গ্রন্থের এগার খণ্ডে[১৮] বুদ্ধের জীবনী কীর্তনাকারে লিখেছিলেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে 'ঢপ' কীর্তনের[১৯] আকারে রচনা করলেন 'বুদ্ধ সন্ন্যাস'। পরবর্তী সময়ে মোহন চন্দ্র বড়ুয়ার অনুপস্থিতিতে তাঁরই আদি শিষ্য সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া শক্ত হাতে কীর্তনের হাল ধরেন। তিনি রচনা করেন 'মার বিজয়' নামক কীর্তনের গ্রন্থটি। তাছাড়া 'সম্ভূমিত্র' ও 'সীবল চরিত'

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন রচনা করেন বিশিষ্ট সংগঠন সাবেক ভিক্ষু সমিতির সম্পাদক, রাঙ্গুনীয়া বৌদ্ধ সমিতির সাবেক সহসভাপতি এবং পদুয়া ইউনিয়ন বৌদ্ধ জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রিয়দর্শী মহাস্থবির। 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' কীর্তন রচনা করেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তপদ স্থবির। সন্তোষ বড়ুয়া রচনা করেন 'শ্যামবর্তী'(অপ্রকাশিত)। অতি সম্প্রীতি 'ধর্মপদ ও চর্য্যাপদ সংকীর্তন' (১ম খণ্ড) রচনা করেন সীতানাথ বড়ুয়া।

যাঁরা কীর্তনের বই লিখেছেন তাদের মধ্যে, মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, সন্তোষ বড়ুয়া, সীতানাথ বড়ুয়া সবাই ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াও। তাঁদের সুরালা কণ্ঠে বুদ্ধের জীবন, বাণী ও দর্শন ইত্যাদি উচ্চারিত হতো। তাছাড়া আরো অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন। যেমন : নিরঞ্জন বড়ুয়া, প্রফুল্ল কুমার বড়ুয়া, প্রিয়দর্শী বড়ুয়া, শাক্যপদ্য বড়ুয়া-১, শাক্যপদ বড়ুয়া-২, মাদল বড়ুয়া (রাউজান), মাদল বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া),তপন বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), পঙ্কজ বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), মদন চৌধুরী (রাঙ্গুনীয়া), মানিক চৌধুরী (রাঙ্গুনীয়া), অজিৎ বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), কিরণ মুৎসুদ্দী (রাঙ্গুনীয়া), সুকুমার বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), মণিলাল বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), নিতোষ বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), মাধব বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), প্রফুল্ল বড়ুয়া(রাঙ্গুনীয়া), গোপাল বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), পরিতোষ বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), বিকাশ বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া), বিমল বড়ুয়া, সনৎ চৌধুরী (সাতবাড়িয়া), সুনব চৌধুরী (চাঁন্দগাও), মাখন বড়ুয়া (চাঁন্দগাও) স্বপন বড়ুয়া, সুধাংশু বড়ুয়া (চকরিয়া), অনিল বড়ুয়া (চকরিয়া), অজিত বড়ুয়া (চকরিয়া), অধ্যাপক বোধিমিত্র বড়ুয়া (মহেশখালী), মাষ্টার সুমন বড়ুয়া (মহেশখালী), সুভাষ বড়ুয়া (মহেশখালী), সুখ লাল লাল বড়ুয়া (মহেশখালী), রাজেন্দ্র বড়ুয়া (মহেশখালী), প্রয়াত লালেন্দ্র বড়ুয়া (রাউজান), মানিক বড়ুয়া (রাউজান), প্রয়াত মনমোহন বড়ুয়া (রাউজান), দীপক বড়ুয়া (রাউজান), অটল বড়ুয়া (রাউজান), মাদল বড়ুয়া-২ (রাউজান), বিজয় বড়ুয়া (রাউজান), রতন বড়ুয়া (রাউজান), পঙ্কজ বড়ুয়া (রাউজান), দুলাল বড়ুয়া (রাউজান) সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া (পটিয়া), সুকুমার বড়ুয়া (পটিয়া), তুষার বড়ুয়া (পটিয়া), রায় মোহন বড়ুয়া (আনোয়ারা থানা), ডা. অধর লাল বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), মিলিন্দরাজ বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), বিপুল বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), রূবেল বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), শ্যামল বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), প্রধান বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা), শিমুল

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া (চন্দনাইশ থানা) মৃদুল কান্তি বড়ুয়া (সাতকানিয়া), প্রয়াত প্যারী মোহন বড়ুয়া (সাতকানিয়া), সুদত্ত বড়ুয়া (সাতকানিয়া), মেম্বার বড়ুয়া (সাতকানিয়া), সুনুক বড়ুয়া (সাতকানিয়া), বিকাশ বড়ুয়া (সাতকানিয়া), বিজয় বড়ুয়া (সাতকানিয়া), প্রকাশ বড়ুয়া (সাতকানিয়া), নিরঞ্জন বড়ুয়া (সাতকানিয়া), নির্মল বড়ুয়া (সাতকানিয়া), বধীয়া বড়ুয়া (সাতকানিয়া), রাজেস বড়ুয়া (সাতকানিয়া), রিটপ বড়ুয়া (সাতকানিয়া), বাবুল কান্তি বড়ুয়া (সাতকানিয়) প্রয়াত মুনীন্দ্র সাধু (সাতকানিয়া), বিমল বড়ুয়া (লোহাগাড়া), সাবুল বড়ুয়া (লোহাগাড়া), চিত্ত রঞ্জন বড়ুয়া (লোহাগড়া), আনন্দ মোহন বড়ুয়া (লোহাগাড়া), বিনাংশু বড়ুয়া (লোহাগাড়া), সুশীল কান্তি বড়ুয়া (লোহাগাড়া), সুভাষ বড়ুয়া (লোহাগাড়া), বিমল বড়ুয়া (লোহাগাড়া), নিবারণ বড়ুয়া (লোহাগাড়া), মিলন বড়ুয়া (লোহাগাড়া), সুধাংশু বড়ুয়া (লোহাগাড়া), আনন্দ বড়ুয়া (লোহাগাড়া), প্রয়াত প্রেমলাল বড়ুয়া (বাঁশখালী), হিমাংশ বড়ুয়া (বাঁশখালী), ফনীন্দ্র বড়ুয়া (বাশঁখালী), পুলিন বিহারী বড়ুয়া (বাঁশখালী), সারঙ্গ বড়ুয়া (বাঁশখালী), সুমন বুড়য়া (বাঁশখালী), পুলিন বিহারী বড়ুয়া (বাঁশখালী), এম. টুকুর বড়ুয়া (বাঁশখালী), প্রয়াত শফেন্দ্র বড়ুয়া (বাঁশখালী), প্রয়াত শচীন্দ্র বড়ুয়া (বাঁশখালী), সোমেন্দ্র বড়ুয়া (বাঁশখালী), ময়ুরধন বড়ুয়া (বাঁশখালী), কবিয়াল কুন্ত মোহন বড়ুয়া (বাঁশখালী), শান্তি কুমার বড়ুয়া (বাঁশখালী), রাতুল বড়ুয়া (বাঁশখালী), উত্তম কুমার বড়ুয়া (বাঁশখালী), রবীন্দ্র বড়ুয়া (বাঁশখালী),প্রয়াত নগেন্দ্র বড়ুয়া (বাঁশখালী), প্রয়াত প্রাণকৃষ্ণ বড়ুয়া (বাঁশখালী), প্রীতি কুসুম বড়ুয়া (লামা), প্রয়াত মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া (রামু), মোহেন্দ বড়ুয়া (মহেশখালী), সুমন বড়ুয়া (মহেশখালী), সুভাষ বড়ুয়া (মহেশখালী), সুখলাল বড়ুয়া (মহেশখালী), প্রয়াত প্রিয়দর্শী বড়ুয়া (উখিয়া), পুলিন বিহারী বড়ুয়া (উখিয়া থানা), চিত্ত বড়ুয়া (উখিয়া), বিমল বড়ুয়া (উখিয়া), বাবুল বড়ুয়া (চাঁন্দগাঁও থানা), প্রয়াত রতিকান্ত বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), গোপাল বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), সাধন বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), ডা. হিমাংশু বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), প্রয়াত ব্রজকিশোর বড়ুয়া (হাট হাজারী), ডা. রমনী মোহন বড়ুয়া (হাট হাজারী), সোপান বড়ুয়া (ফটিকছড়ি), দোলন বড়ুয়া (হাট হাজারী), গৌতম বড়ুয়া (বোয়ালখালী), রবীন্দ্র বড়ুয়া (বোয়ালখালী), মাখন বড়ুয়া (বোয়ালখালী), প্রয়াত সন্তোষ বড়ুয়া (বোয়ালখালী), সীতাংশু বড়ুয়া (বোয়ালখালী), রাজু বড়ুয়া (বোয়ালখালী), সাগর বড়ুয়া (বোয়ালখালী), কাজল

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া (বোয়ালখালী), সুমন বড়ুয়া (বোয়ালখালী), অপূর্ব বড়ুয়া(বোয়ালখালী), কমল বড়ুয় (বোয়ালখালী), রনি বড়ুয় (বোয়ালখালী),মৃদুল কান্তি বড়ুয়া (বোয়ালখালী), জ্ঞানদা বড়ুয়া (বোয়ালখালী), বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া (বোয়ালখালী), মদন বড়ুয়া (সাতকানিয়া), মেম্বার রাজীব বড়ুয়া (সাতকানিয়া), সহদেব বড়ুয়া (মীরসরাই), চঞ্চুন বড়ুয়া(মীরসরাই), বাবুল বড়ুয়া (মীরসরাই) সঞ্চয় সিংহ (লাকসাম), ডা. বীরেন্দ্র সিংহ (লাকসাম), বিন্দু সিংহ (লাকসাম), মানিক সিংহ (লাকসাম), বুদ্ধ সিংহ (লাকসাম), মুনিন্দ্র সিংহ (লাকসাম), প্রয়াত ধনা সিংহ (লাকসাম), সুকুমার সিংহ (লাকসাম), অনিল সিংহ (লাকসাম), বিমল সিংহ (লাকসাম), বিজয় সিংহ (লাকসাম), জগদীশ সিংহ (লাকসাম), চিত্ত সিংহ (লাকসাম), মিন্টু সিংহ (লাকসাম), সবুজ সিংহ (লাকসাম), মানিক সিংহ-২ (লাকসাম), প্রেমানন্দ সিংহ (লাকসাম), রবীন্দ্র সিংহ (লাকসাম), ধীরেন্দ্র সিংহ (লাকসাম) আপন সিংহ (লাকসাম), পুলিন সিংহ (লাকসাম), সুরেশ সিংহ (সদর দক্ষিণ কুমিল্লা), সুভাষ সিংহ (সদর দক্ষিণ কুমিল্লা), সবুজ সিংহ (সদর দক্ষিণ কুমিল্লা), বিপুল সিংহ (সদর দক্ষিণ কুমিল্লা), অনুক্রম বড়ুয়া (সদর দক্ষিণ কুমিল্লা), রবীন্দ্র সিংহ (লাকসাম), অমূল্য সিংহ (লাকসাম), মনমোহন সিংহ (লাকসাম) নেপাল সিংহ (লাকসাম), দিবাকর সিংহ (লাকসাম), মনহরি সিংহ (লাকসাম), লক্ষণ সিংহ (লাকসাম), দুলাল সিংহ (লাকসাম), বিকাশ সিংহ (লাকসাম), মৃণাল সিংহ (লাকসাম), অমিয় সিংহ (লাকসাম), বাবুল সিংহ (লাকসাম), অমূল্যসিংহ-২ (লাকসাম), দিলীপ সিংহ (লাকসাম), নিবারণ সিং (লাকসাম), বিরল সিংহ(লাকসাম), শচীন্দ্র সিংহ (লাকসাম), মন্টু সিংহ (লাকসাম), ধীরেন্দ্র সিংহ(লাকসাম), তুলতুল সিংহ (লাকসাম) ইত্যাদি।

বৌদ্ধ কীর্তন ও প্রাসঙ্গিক কথা

বাংলাদেশের বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তনীয়া কখনো উত্তরাধিকারী সূত্রে কিংবা পুরুষানুক্রমিকভাবে কীর্তন করতো না। তাছাড়া এটাও সত্য তারা কখনো কীর্তনকে পেশা হিসেবে পছন্দ করতো না। এমনকি বাধ্যবাধকতাও নয়। স্বপ্রণোদিত হয়ে এ জনগোষ্ঠীর উৎসাহীজনরা কীর্তন দল গঠন করে। তাঁরা বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে কিংবা বিহারে গিয়ে কীর্তন পরিবেশন করেন। তবে আশার কথা যে, বৌদ্ধ কীর্তনীয়াদের মধ্যে ডা. থেকে শুরু করে

Dhaka University Institutional Repository

এম. এ পাশ পযর্ন্ত কীর্তনীয়া রয়েছে। আবার অনেক তার্কিক, তাত্ত্বিক, সুসাহিত্যিক, সুমিষ্টভাষী কীর্তনীয়াও আছে যাদের অক্ষরজ্ঞান যৎসামান্য। তবুও তাঁরা কীর্তনের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আবার অনেক কীর্তনীয়া আছে যারা ভালো গায়ক, কিন্তু উপস্থিত সমজদার দর্শক-শ্রোতাদের পদের অর্থগুলো উত্তমরূপে বোঝাতে সক্ষম হয় না। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। প্রত্যেকটি সংগীতের জন্য আলাদা আলাদা সংগীত চর্চার একাডেমী থাকলে এ কীর্তনের জন্য কোনরকম প্রশিক্ষণ একাডেমী নেই। তারপরেও এই বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বুদ্ধ কীর্তনকে পুনরুদ্ধার প্রসার করার প্রয়াসে ঘরোয়া পরিবেশে কীর্তন শেখার আয়োজন করে। এক সময় পটিয়া কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহারে আয়োজন করে মাসিক কীর্তন শেখার আসর। আসরগুলো নিম্নরূপঃ

০৭/১১/২০০২ খ্রী. উদীয়মান কীর্তনীয়া নির্মল বড়ুয়াকে (পটিয়া) দিয়ে মাসিক কীর্তনের শুভযাত্রা। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া বিভূতি ভূষণ বড়ুয়ার উত্তরসুরী।

০৫/০১/২০০৩ খ্রি. কীর্তনের দ্বিতীয় আসর বসে। এ দিন কীর্তন পরিবেশন করেন এখনকার সময়ের সবচেয়ে প্রবীণ কীর্তনীয়া সংগীতে নিবেদিত প্রাণ বাবু কিরিটি বিকাশ বড়ুয়া (পটিয়া) পালা কীর্তন বুদ্ধ সন্ন্যাস পরিবেশন করেন। ৭২ বৎসর বয়সে তাঁর কীর্তন পরিবেশনা দেখে উপস্থিত কীর্তনামোদী সবাই মুগ্ধ হতেন।

০৬/০২/২০০৩ খ্রি. কীর্তনের তৃতীয় আসর বসে। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া বাবু মিলিন্দরাজ (চন্দনাইশ) পালা কীর্তন সম্ভুমিত্র পরিবেশন করেন। খুব সুন্দর সহজ ভাষায় তিনি কীর্তন পরিবেশন করেন। এত সুন্দরভাবে চটুল সুরগুলো প্রয়োগ করেছিলেন যে সবাই আশ্চার্য হতেন। তিনি সাড়া জাগানো কণ্ঠ শিল্পী বাবু বোধিসত্ত্ব বড়ুয়ার অনুজ প্রতিম।

১৩/০৩/২০০৩ খ্রি. তারিখে বসে কীর্তনের চতুর্থ আসর। এ সময় কীর্তন পরিবেশন করেন সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা শাকপুরা (বোয়ালখালী) নিবাসী সুনীল বড়ুয়া। এই সময় তিনি পরিবেশন করেন পালা কীর্তন বুদ্ধের জন্ম। তাঁর পরিবেশন ছিল খুবই প্রাণবন্ত এবং জনমুগ্ধকর।

৫ম কীর্তনের আসর বসে ১৮/০৪/২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। এ দিন নির্ধারিত কীর্তনীয়ার অনুপস্থিতিতে কীর্তন পরিবেশন করেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ কীর্তনীয়া মি. কিরিটি বিকাশ বড়ুয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ আসন বসে ০৫/০৫/২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। কীর্তন পরিবেশন করেন ফতেনগরের ইউ. পি. সদস্য ডা. সুজিত বড়ুয়া (ফতেনগর)। তার ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বৌদ্ধ কীর্তন পরিবেশন করে অন্যান্য কীর্তনীয়াদের উৎসাহ প্রদান করে আসছে।

সপ্তম আসর বসে ২৫/০৭/২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। এ দিন কীর্তন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া বাবু তুষার কান্তি বড়ুয়া। তিনি পটিয়া কর্তালা নিবাসী। তিনি পরিবেশন করেন বিনয়াচার্য বংশদ্বীপ মহাস্থবিরের জীবন নিয়ে স্বরচিত পালা কীর্তন।

অষ্টম আসর বসে ১২/০৯/২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এ দিন পটিয়া থানার বেলখাইন গ্রামের অর্ন্তগত উদীয়মান প্রতিভাবান তরুণ কীর্তনীয়া মি. সুকুমার বড়ুয়া।

বৌদ্ধ কীর্তনের চর্চা এখন আগের তুলনায় আর তেমনভাবে হয় না। তারপরও এ ধরণের কীর্তন শেখার আসরের উদ্যোগটি সবার হৃদয়ে আশার সঞ্চার জাগিয়ে তোলে। ধারণা করা হয়, এ রকম আয়োজন আমাদের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা হারানো বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সুর ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নতুনভাবে পরিচয় করে দেবে বর্তমান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে।

এমন একসময় ছিল অর্থবৈভব সম্পন্ন বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন উপলক্ষে কীর্তনের আসর বসাতো। কীর্তনের এ আসর পালা কীর্তন হয় আবার পাল্টা কীর্তনও হয়। দেশের বিভিন্ন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া এ আসরে গান করার জন্য আসতো। বড় বড় কীর্তনীয়ারা নিজেদের কণ্ঠের মাধুর্যতা তথা গায়কী কৌশলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কীর্তন পরিবেশন করতেন। এ সময় উপস্থিত কীর্তনামোদী দর্শক-শ্রোতা খুশী হয়ে টাকা কিংবা টাকার মালা কীর্তনীয়ার গলায় পরিয়ে দেয়। এখন বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তনের মধ্যে এ ধারা প্রচলিত রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যউৎস

১. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ৩৮

২. ঐ, পৃ. ৩৮

৩. সীতানাথ বড়ুয়া, ধম্মপদ ও চর্যাপদ সংকীর্তন, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম, ২০০৮), পৃ. ১০

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য (কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ১৬৩

৫. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, শ্রীপদামৃত মাধুরী, ১ম খণ্ড (কলিকাতা) পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬. এস. এম. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশের জারীগান (ঢাকা, ১৯৮৬) পৃ. ২৪

৭. ঐ, পৃ. ২৫

৮. মৃগাঙ্গ শেখর চক্রবর্তী, বাংলার কীর্তন গান (কলিকাতা, ১৯৯৮), পৃ. ৮

৯. মাদল বড়ুয়া, গ্রাম কুলকুলমাই, থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, সাক্ষাৎকারের তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯। তিনি একজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ কীর্তনীয়া। তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে গিয়ে কীর্তন পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

১০. আসরে দাঁড়িয়ে উভয় কীর্তনীয়া এবং উভয় কবিয়াল প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করার জন্য একজন আরেকজনকে জটিল প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন এবং উভয়েই সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন। এটাকে পাল্টা কীর্তন এবং কবিগানে জোটক বলা হয়।

১১. বৃন্দাবন দাস রচিত, চৈতন্য ভাগবত (কলিকাতা, ১৯৩৮), পৃ. ১/৭

১২. প্রাণকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত, চৈতন্য চরিতামৃত (কলিকাতা), পৃ. ২/১

443761

১৩. চৈতন্য ভাগবত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩/৫

১৪. ঐ, পৃ. ৩/৫

১৫. চৈতন্য চরিতামৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪/১৬

১৬. ঐ, পৃ. ১৪/১৬

১৭. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ. ২২২

১৮. তিনি ছিলেন সদা হাসোৎজ্জ্বল এবং সদালাপী একজন নন্দিত ব্যক্তিত্ব। তাঁকে স্বভাব কবিও বলা হয়। তিনি ছন্দে ছন্দে কবিতা রচনা করতেন খুব সহজেই। তিনি ১১টি বৌদ্ধ কীর্তনের বই রচনা করেছিলেন তন্মধ্যে সাতটি বই ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচনা সম্পন্ন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. 'ঢপকীর্তন' হলো কীর্তনের মাধ্যমে কথোপকথন অনেকটা গীতি আলেখ্য কিংবা গীতিনাট্যের মতো একপ্রকার সৃষ্ট গান। কীর্তনের বহু বৈশিষ্ট্য ঢপ কীর্তনে করা হয়নি। কীর্তনের মতো আখরের ব্যবহার নেই এ ঢপকীতনে। এ কীর্তন পদ অনুপ্রাসবহুল। ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিধান করে কীর্তন পরিবেশন পদ্ধতিই ছিল 'ঢপকীর্তন'।

২০. অধ্যাপক অভিজিৎ বড়ুয়া মানু সম্পাদিত, বোধি, (চট্টগ্রাম, ২০০৩), পৃ. ৫৫- ৫৭

২১. কীর্তনের এ আসর পালা কীর্তন হয় আবার পাল্টা কীর্তনও হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কীর্তনের উপকরণ পরিচয় ও পরিবেশন পদ্ধতি

প্রায় গানেই উপকরণ অত্যাবশ্যকীয়। উপকরণ ব্যতীত কোন গানই দর্শক-শ্রোতাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং এ উপকরণ কীর্তনের জন্যও দরকার। তাই এক্ষেত্রে কীর্তনের জন্য মঞ্চ, বাদ্যযন্ত্র, গায়কদলের প্রয়োজন আছে। সাধারণত এগুলোই কীর্তনের প্রধান উপকরণ।

মঞ্চ

এ দেশের অর্থ-বিত্তশালী বৌদ্ধদের গৃহে কিংবা বৌদ্ধ বিহারে বিভিন্ন পূজ-অর্চণায় কীর্তন গান পরিবেশিত হতো। সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষরা বিনামঞ্চে কিংবা চাটাই বা মাদুর বসিয়ে কীর্তনের আসর বসাত। খোলা জায়গায় বিশাল চাঁদোয়ার নীচে কীর্তনের আসর আয়োজন করা হয়। এ কীর্তনের জন্য তেমন কোন মঞ্চের প্রয়োজন নেই। তারপরও অনেকেই দশ হাত কিংবা বার হাত দৈর্ঘ ও প্রস্থ হিসেবে বাঁশের খুঁটি দিয়ে মঞ্চ তৈরি করে। মঞ্চের ভিতর থাকে কীর্তনীয়া এবং দোহাঁরীরা। তাছাড়া মঞ্চের ভিতর আলোকবাতির (বিশেষ করে ইলেকট্রিকলাইট কিংবা ম্যানথল লাইট) ব্যবস্থা করা হয়[১]।

কীর্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

অন্যান্য লোকসংগীতের ন্যায় কীর্তনেও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক বনশ্রী মহাথেরো বলেন ; অতীতে এদেশের বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কীর্তনের বেলায় হয়তো বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার তেমন ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে কীর্তনের বিষয়বস্তু ভাব-ভাবনা, কলা-কৌশলের দিক দিয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হবার সাথে সাথে বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্তমানে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র কীর্তনে ব্যবহার হয় তা হলো মৃদঙ্গ বা খোল, মন্দিরা, কাঁসা, হারমোনিয়াম প্রভৃতি[২]। তবে অন্য এক বৌদ্ধ পণ্ডিত রতনশ্রী মহাথের বলেন; বর্তমানে কীর্তনকে আরো আর্কষণীয় করে তোলার জন্য বিপুল, ক্ল্যারিওনেট এবং মুরালি বাঁশিও কোন কোন কীর্তনীয়া তাদের কীর্তন দলে অর্ন্তভুক্ত করেন[৩]। 'চৈতন্যভাগবত' নামক গ্রন্থে[৪] কীর্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ রয়েছে এভাবে ;

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্খ ঘন্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল
সঙ্কীর্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল

অন্যদিকে আবার কীর্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী লিখেছেন ; সংকীর্তনে প্রধান বাদ্যযন্ত্র খোল ও করতাল । খোলের অপর নাম মৃদঙ্গ। বর্তমান মৃদঙ্গ বলতে পাখোয়াজ বুঝায়। কিন্তু তা এক্ষণে আর মৃত্তিকায় নির্মিত হয় না। খোল মৃর্ত্তিকা দ্বারা নির্মিত হয়। অন্য কোন উপায়ে নির্মিত হলে তাকে খোল বলে না। খোল ব্যতীত বিশুদ্ধ কীর্তন হয় না।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, কীর্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা সুর নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো দেখা যায় ; ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন তাল। এ সমস্ত তালের আবার সঙ্গম, লয়, লহর, মাতান, তেহাই, ফাক এবং তার পৃথক পৃথক বোল আছে। কীর্তনে যেমন আখর আছে তেমনি আবার কাটান আছে। গায়ক যেমন আখরের পর আখর দিয়ে অথবা সুরের বিভিন্ন ভঙ্গীতে আখরের পুনরাবৃত্তি করে শ্রোতাদের হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দলোকের রসতরঙ্গ সৃষ্টি করেন বাদক তেমনি কাটানে সুরের অনুরূপ বাজনায় ঢেউ তুলে আসরে ধ্বনির অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে[৫]। এ রকমের একটি সর্বজনীন ও নন্দিত উক্তি প্রায় সকল কীর্তনের জন্য প্রযোজ্য।

কীর্তন দল

যারা একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ঐকান্তিক আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কীর্তন পরিবেশন করেন তাদের বলা হয় কীর্তন গানের দল। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেরই কীর্তন গান দল একই রকমের। কীর্তন গান একক সংগীত নয়, যৌথ সংগীত বা সমবেত সংগীত। এ কীর্তন যেমন একজন লোক করতে পারে না তেমনি আবার ২০/৩০ জন লোকেরও দরকার নেই। এ কীর্তন গানের দলে একজন প্রধান কীর্তনীয়া, ৩/৪ জন দোঁহারী, এককজন মৃদঙ্গ বাদক, একজন কাঁসা বাদক, একজন মন্দিরা বাদক, একজন হারমোনিয়াম বাদক নিয়েই এ কীর্তন গান-এর দল গঠন করা হয়। তবে উল্লেখ থাকে যে, মন্দিরা বাদক এবং কাঁসা বাদক দোঁহারীর কাজ সম্পাদনও করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তাতে দোহারীর সংখ্যা কমে আসবে। কীর্তনে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেশী করতে চাইলে এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে কিন্তু এ সংখ্যা কখনো ৮ জন কিংবা ১০ জনের অধিক হয় না। কীর্তনের দলকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা ক. কীর্তনীয়া বা প্রধান গায়ক, খ. দোঁহার বা দোঁহারী এবং গ. বাদক ।

ক. কীর্তনীয়া বা প্রধান গায়ক

'কৃৎ' প্রত্যয় যোগে কীর্তনীয়া পদবন্ধ হয়। এটি একটি অর্থবোধক শব্দের নামও বটে। এখানে বৌদ্ধ কীর্তনীয়া বলতে যিনি সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবনকাহিনী এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও বুদ্ধের সমকালীন রাজা-শ্রেষ্ঠীদের যশোকথা, খ্যাতি, গৌরবময় কথা গদ্য কিংবা কবিতার ছন্দে আবৃত্তি করেন তাকে বলা হয় কীর্তনীয়া[৬]। অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া বলেন ; বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা করার জন্য যে মূল গায়ক থাকেন তাকে বলা হয় কীর্তনীয়া। কীর্তনে প্রধান বা মূল গায়কই সর্বেসর্বা। তিনি দলটি পরিচালনা করেন। দোঁহারী এবং বাদকদের এ বিষয়ে তিনি নানারকম নির্দেশ প্রদান করেন। কোন গানটি কখন কিভাবে পরিবেশন করতে হবে, কোথায় 'আখর', 'তুক' এর আবশ্যকতা আছে সবই কীর্তনীয়া কর্তৃক নির্ণীত হয়। তাঁর এসব ভূমিকা পালনের সময় দোঁহারী এবং বাদকরা সকলপ্রকার সহযোগিতা করেন মাত্র।

কীর্তনীয়ার পোষাক

বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনীয়ার পোষাকে তেমন কোন বৈচিত্রতা নেই। কীর্তনীয়ার বয়স যদি কম হয় তবে তিনি শার্ট প্যান্ট পরিধান করে কীর্তন পরিবেশন করেন। বয়োবৃদ্ধ কীর্তনীয়া হলে গায়ে সাদা পাঞ্জাবী পরনে ধুতি এবং কাঁধে সাদা চাঁদর ব্যবহার করেন সচরাচর।

খ. দোঁহার কিংবা দোঁহারী

বৌদ্ধ কীর্তন দলীয় সংগীত। কীর্তনীয়াসহ ৮ জন কিংবা ১০ জন নিয়ে 'কীর্তন দল' গঠিত। বলা যায়, এখানে কীর্তনীয়াই প্রধান বা আসল গায়ক। কীর্তনের আসরে কীর্তনীয়াকে কীর্তন পরিবেশনে যারা সাহায্য করে তাদেরকে বলা হয় দোঁহার কিংবা দোঁহারী। এতে দোঁহার কিংবা দোঁহারীকে কোনভাবে খাটো করে দেখা যায় না। মূলত

Dhaka University Institutional Repository

'দোঁহা' থেকে দোঁহারী কিংবা দোঁহারীর উৎপত্তি। এখানে দোঁহা বলতে তিন কিংবা চার চরণযুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উক্ত রয়েছে ; বৌদ্ধ রচিত হাজার বছরের পুরানো দোঁহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হতে দোঁহা কথার উৎপত্তি কিনা কে বলবে? অনেকে বলেন ; মূল গায়কের গাইহবার পর দু'বার গাহে বলিয়া ইহাদের নাম দোঁহার। দোঁহা শব্দে উভয় বুঝায়, দুই পার্শ্বের গাহিবার সঙ্গী, হয়তো এইজন্য বলে দোঁহার। ইহাদের গান দোঁহারী। সংগীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া গানে মূল গায়কের গানের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমাইয়া রাখা দোঁহারের কাজ[৭]। দোঁহারীর ভূমিকা বৌদ্ধ কীর্তনে খুবই গুরুত্বপূর্ন। কীর্তনের ভাব-গাম্ভীর্যতা, রসময়তা, তাল-লয়, সুর-মাধুর্যতা ইত্যাদি দোঁহারীর উপর নির্ভর করে। সুর-তাল-লয় ঠিক রেখে কীর্তন পরিবেশন করা দোঁহারীর অন্যতম প্রধান কাজ। তাই বৌদ্ধ কীর্তনে অভিজ্ঞ দোঁহারী অত্যাবশকীয়। অভিজ্ঞ দোঁহারী না থাকলে কীর্তন প্রাণবন্ত এবং শ্রুতিমধুর হয়ে উঠে না কখনো। এমনকি কীর্তন দর্শক-শ্রোতাদের মনোজগৎ জয় করতে পারে না। বাদ্য-বাদকরা এখানে দোঁহারীর কাজ করতে পারে তাতে কোনরকম কারো আপত্তি থাকে না। কীর্তন পরিবেশন কালে কীর্তনীয়ার পোষাকের ন্যায় দোঁহারীরও পোষাক-পরিচ্ছেদে তেমন কোনরকম বৈশিষ্ট্য নেই। তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং স্ব -স্ব পছন্দানুসারে পোষাক পরিধান করেন। তবে এটা উল্লেখ থাকে যে, এ সময় কীর্তনদলের সবাই সুন্দর শ্বেত-শুভ্র কাপড় পরিধান করে।

গ. বাদক

প্রায় সবগানেই বাদকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাদ্য-বাদকের উপর গানের উপভোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সর্বোপরি দর্শক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এক্ষেত্রে কীর্তনেও বাদকদলের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। এখানে বাদ্য-বাদকের সংখ্যা ৪/৫ জন হয় তবে বাদকের এ সংখ্যা আরো বাড়ানো যেতে পারে । দোঁহারীর ন্যায় বাদকদলের পোষাকের কোনরকম বৈচিত্র্য নেই এখানে ।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তনের স্থান

কীর্তন বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজকের আঙ্গিনায় অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বৌদ্ধ বিহার ছাড়াও মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আয়োজন করা হয় এ কীর্তন । মোটকথা, খোলা জায়গায় কীর্তনের আসর বসে যেখানে অনেক লোক একসঙ্গে বসে এই গান শ্রবণ করে। এমতাবস্থায় বৈঠকী মেজাজ ধরে রাখা খুবই কঠিন। তার মধ্যে যদি আবার কীর্তনীয়া দুর্বোধ সুরে কীর্তন পরিবেশন করে তবে দর্শকদের আরো অসুবিধা হয়। তাই সঙ্গত কারণে সহজ- সরলতর কীর্তন এখানে দরকার হয়ে পড়ে। কীর্তন বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সেতুবন্ধন। এ জনগোষ্ঠীর কীর্তন গান অতি সমৃদ্ধ হলেও সরকারী কিংবা বেসরকারী অথবা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদেরপ্রচেষ্টায় কখনো কোন ক্লাব গৃহে, টাউন হলে, প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়নি তেমনি আবার বেতার কিংবা টেলিভিশনে প্রচারিত হয়নি আজো।

কীর্তনের দল

কীর্তন পর্ব সংগীত নয়, মৌসুমী সংগীত। এ কীর্তন গানের অনুষ্ঠান বিশেষ করে শীতকালে অনুষ্ঠিত হয় বেশি। রাত নয়টা কিংবা দশটার মধ্যে এই কীর্তন শুরু হয় আর শেষ হয় সূর্যোদয়ে। এ সময় বিশেষ করে পালা কীর্তন আর পাল্টা কীর্তন হয়। তবে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে, বিভিন্ন পূর্ণিমা কিংবা কঠিনচীবর দান অনুষ্ঠানে, মহাস্থবির বরণ অনুষ্ঠানে 'ছুটা' কীর্তনের আয়োজন করা হয়।

কীর্তন পরিবেশন পদ্ধতি

আগই বলেছি, মঞ্চের ভিতরে কীর্তনীয়ার দল বসে। তবে প্রধান কীর্তনীয়া বসে কীর্তনীয়া দলের মাঝখানে । সবাই মঞ্চে আসনগ্রহণ করার পর বাদকদল যন্ত্রসংগীত শুরু করে (concert)। এ যন্ত্র সংগীত শেষ হলে আরম্ভ হয় সবার মনোযোগ আর্কষণ পর্ব। যেমন :

মহানন্দে বুদ্ধ, ধর্ম ,সংঘের নাম বলো। [৮]

Dhaka University Institutional Repository

দোঁহারীরা তিনবার সমস্বরে এটি উচ্চস্বরে বলে এই সময় বাদ্যযন্ত্র হাইস্কেলে বাজনো হয়। এটি আবার অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়। যথা : জয় জয় প্রেমানন্দে আনন্দে সবাই একবার বুদ্ধ ধর্ম সংঘের নাম বলো[১]। এ রকমের মনোযোগ আর্কষণ পদ্ধতি সমাপ্ত হলে প্রধান কীর্তনীয়া সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে আসনে দাঁড়িয়ে আসর বন্দনা বা প্রস্তাবনা সংগীত আরম্ভ করে। সচরাচর এ ধরনের গীতগুলো একটু ভিন্ন স্বাদের হয়। এ ধরনের কয়েকটি গীত নিম্নরূপ:

ক. এস গৌতম এস গৌতম
এস সিদ্ধার্থ এস গৌতম
এস হে গৌতম মায়ার নন্দন
শাক্যমুনি শাক্য রাজাহে
পূজিব চরণ সেই আকিঞ্চন

রাখিব হৃদয় মাঝে হে
(মোরা) চরণ পূজা করিব।
ভক্তি চন্দন পুষ্প দিয়ে চরণ পূজা করিব।
হৃদি পদ্ম রাখি তোমায় চরণ পূজা করিব।
ঝুমুর –নয়ন জলে ধোয়াইব চরণ পূজা করিব
হা- হা - হা - রে, হে হে- হে- হা- হা - হা

শাক্য মুনি
ভক্তগণের নয়ন মণি শাক্য মুনি
মুনিগণের শিরোমণি শাক্য মুনি
ত্রিভবের উজ্জ্বল মণি শাক্য মুনি

এসহে এসহে
ভক্তগণে ডাকি তোমায় এসহে এসহে

কর জোরে ডাকি তোমায় এসহে এসহে
ঝুমুর – হৃদয় কমলে আসন দিব এসহে এসহে।

Dhaka University Institutional Repository

হা- হা- হা--রে, হে- হে- হে- হা - হা - হা [১০]

খ. আয় সবে মিলি, হিংসা দ্বেষ ভুলি
বুদ্ধের নাম গাহিরে।
মানব জন্ম সফল কারণ
জপ সবাই এই নামরে।

আসিল বুদ্ধ এ বিশ্ব ভুবন
জীবের দুঃখ করিতে মোচন।
সুমেরু হতে কুমেরু অন্তে
গাহে বুদ্ধের জয় গীতরে।

পাপী তাপী শোকী মুক্তির কারণ
লভিল যারা বুদ্ধেরী শরণ
বুদ্ধের নাম সদা তারা জপিল
ভব জ্বালা তাদের বিদূরিত হইল[১১]।

গ. আজি শাক্যসিংহ চলেরে জীবগণ উদ্ধার তরে
জীবের উদ্ধার জগত উদ্ধার মানব উদ্ধার তরে।
পরিহরি রাজপুরী পিতা মাতা সবারে
মুকুলিতা স্বর্ণলতা দণ্ডসুতা ছেড়েরে।

কি মাধুরী খেলে মুখে কি মাধুরী অধরে
শারদ জোছনা যেন চলেছে মূর্তি ধরে,
দেখবি যদি কে কে তোরা আয় আয় আয়রে।
আয় আয় আয়রে
দেখবি যদি রূপ মাধুরী আয় আয় আয়রে

Dhaka University Institutional Repository

ও পুরবাসী আয় আয় আয়রে
ও নগরবাসী আয় আয় আয়রে[১২]।

. এস দয়াময় পূজি ভক্তি কুসুম লইয়ে
হৃদয়ে হৃদয়ে এসরে মিলায়ে পড়ি তাঁর পদে লুটায়ে।
দয়াময় তিনি দয়ার আলয়
বিপদের বন্ধু সম্পদ আশ্রয়।

শুভ আশীর্বাদ মাগি গো সবাই নব প্রেমভূষা পরিয়ে
সূর্য রশ্মি কিংবা বিমল চন্দ্রিকা
নারে আলোকিত হৃদয় কণিকা
পাবে শুধু তাঁর কৃপালোকে একা আলোকিত হৃদি আলয়ে।

এ আশীর্বাদ কর হৃদয় রঞ্জন,
সহাস্য আননে করিব গমন,
পাই যেন মোরা শান্তি নিকেতন যাব যবে ভব ত্যাজিয়ে।
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষজনের মাঝে,
যন্ত্রবিহীনে যন্ত্র কি প্রকারে বাজে।

আমি হলাম কাঠের যন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী
যন্ত্র ধরে গান কর হে নির্বাণ বিহারী।
ভক্তি ভরে প্রণমিলাম শ্রীবুদ্ধ চরণ
কৃপা ভিক্ষা চাই মোরে করহে তরণ[১৩]।

ঙ. প্রথমেতে বন্দি আমি অষ্টবিংশতি বুদ্ধগণ
যাঁদের প্রভাবে মার করিল পলায়ন।
তাঁদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম
শিরদেশে তাঁদের আমি দিলাম স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধগণকে শিরোপরে রেখে পথ চলিলাম,
ধর্মকে নয়নে আমার প্রতিষ্ঠা করিলাম।
পবিত্র সংঘকে আমার বক্ষে দিলাম স্থান,
তাঁদের চরণে আমার ষষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হৃদয়েতে অনুরুদ্ধ আছেন আমার,
দক্ষিণেতে সারিপুত্র আছে আবার।
কৌন্ডন্য পৃষ্টদেশে মৌদ্‌গলায়ন বামে,
আনন্দ ও রাহুল আছেন আমার দক্ষিণে কর্ণে।

বাম কর্ণে মহাকাশ্যপ মহানাম স্থিত,
পৃষ্ঠদেশে শ্রীমুনিন্দ্র আছেন প্রতিষ্ঠিত।
মুখমণ্ডলে স্থি আছেন কাশ্যপ কুমার,
পঞ্চ স্থবির স্থিত আছেন ললাটে আমার।

সর্বজয়ী শ্রীমুনিন্দ্র সর্ব গুণধার,
অসীতি মহাস্থবির আছেন শরীরে আমার।
পুরোভাগে রত্নসূত্র আর মৈত্রীয় দক্ষিণে,
পশ্চাদদে ধ্বজাগ্র আমার অঙ্গুলিমাল বামে।

খন্ধ, আটানাটিয়া আর মোর পরিত্রাণ,
অবশিষ্ট সূত্র আমায় করেঝে আচ্ছাদন।
আসর বন্দনা করি অষ্টবিংশতি বুদ্ধগণের নামে,
বুদ্ধের শাসন রক্ষা হোক তাঁদের প্রভাবে[১৪]।

এভাবে আসর বন্দনা করার পর পরই কীর্তনীয়া মঞ্চের চারদিক ঘুরে ঘুরে কীর্তনের 'কথা'র মাধ্যমে কীর্তন আরম্ভ করে। এ 'কথা' হলো কীর্তনকে অনুভব করার অন্যতম উপায় বিশেষ। কীর্তন একপ্রকার ভাবসংগীত। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তনীয়া বাদক এবং শ্রোতা সকলেই ভক্তজন। কীর্তন করার লক্ষে দরকার পুতপবিত্র মন। মন সকলধর্মের পূর্বগামী। তাই ইক্ত হয়েছে ; কীর্তন করিবে মনের আনন্দে। এমনভাবে গান করবে যেগুলো শুনলে শ্রোতার মন বিগলিত হয়[১৫]। কীর্তনের অনেক তত্ত্বমূলক পদ বা পদাংশ সহজেই উপস্থিত অনেক দর্শক-শ্রোতা বুঝতে পারে না। তাই কীর্তনীয়া কীর্তন পরিবেশন করার সময় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ হতে বিষয়বস্তুকে বুঝিয়ে দেবার জন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে 'আখর' 'তুক' পরিবেশন করার প্রথা রয়েছে। এ সময় কীর্তন আর্কষণীয় হয়ে উঠে। কীর্তনের এক একটা আবার বিশেষ জায়গায় দোঁহারীরা একই পদাংশ বা ধূয়া উচ্চ স্বরে বার বার গাইতে থাকেন। সঙ্গে খুব জোরে খোল বা মৃদঙ্গ বাজতে থাকেন। এর ফলে মাতোয়ারা ভাব আসে বলেই বোধ হয় এটির নাম 'মাতান'। এই সময় সমাগত উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা মাতিয়া যায়। আসরে জোরে জয়ধ্বনি উঠে। কুলবধূরা উলু দেয়। তবে বৌদ্ধ কীর্তনে কীর্তনগান সমাপ্তিকরণে এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে যা সচরাচর অন্যকোন কীর্তনে তেমন দেখা যায় না। 'বুদ্ধ সন্ন্যাস' নামক গ্রন্থে[১৬] এ বিষয়ে দেখা যায় ;

ভুবন মঙ্গল বুদ্ধের নাম বলরে বদন ভরে
প্রেমানন্দে নেচে নেচে ভুবন মঙ্গল বুদ্ধের নাম বলরে বদন ভরে
প্রেমানন্দে বাহু তুলে ভুবন মঙ্গল বুদ্ধের নাম বলরে বদন ভরে
নিরানন্দে যাবে দুরে ভুবন মঙ্গল বুদ্ধের নাম বলরে বদন ভরে
বলতে বড় ভালোবাসি ভুবন মঙ্গল বুদ্ধের নাম বলরে বদন ভরে

বুদ্ধ বল বলরে
নারদ জপে বাণীর তারে বুদ্ধ বল বলরে
ইন্দ্র জপে বাহু তুলে বুদ্ধ বল বলরে
গঙ্গা জপে শত মুখে বুদ্ধ বল বলরে
পঞ্চানন পঞ্চ মুখে বুদ্ধ বল বলরে
ব্রহ্মাজপে চতু মুখে বুদ্ধ বল বলরে
পাতারে বাসুকী জপে বুদ্ধ বল বলরে

Dhaka University Institutional Repository

দেবগণ দেবালোকে বুদ্ধ বল বলরে
দেবীগণ দেবধামে বুদ্ধ বল বলরে
মর্তে জপে নর-নারী বুদ্ধ বল বলরে
মধুমাখা এ বুদ্ধের বুদ্ধ বল বলরে
যতবল তত ভাল বুদ্ধ বল বলরে

প্রেমানন্দে
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বল প্রেমানন্দে
বুদ্ধ নাম জপে সবে প্রেমানন্দে
ধর্ম নাম জপে সবে প্রেমানন্দে
সংঘ নাম জপে সবে প্রেমানন্দে

প্রেমানন্দে নেচে নেচে বুদ্ধ বল বুদ্ধ
বাহু তুলে নেচে নেচে বুদ্ধ বল বুদ্ধ
যতবল তত ভাল বুদ্ধ বল বুদ্ধ
বলতে বড় ভালোবাসি বুদ্ধ বল বুদ্ধ
ভুবন মঙ্গল নাম বুদ্ধ বল বুদ্ধ
সুধা মাখা ঐ বুদ্ধ নাম বুদ্ধ বল বুদ্ধ
প্রেমানন্দে একবার সবাই মিলে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বল।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, কীর্তন পরিবেশন শেষ হলে আবার মনোযোগ আর্কষণ পদ্ধতি অর্থাৎ ঝুমুর দিয়ে কীর্তনের পরিসমাপ্তি হয়। এভাবে বৌদ্ধকীর্তন সমাপ্ত হলে কীর্তন দলের সবাই বসে কীর্তন গানের আলোচনা এবং সমালোচনা করেন নিজেরাই। কোন এক জায়গায় যদি ভূল-ত্রুটি হয়ে থাকে তা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে পরিবেশন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যউৎস

১. সাক্ষাৎকার : সুভাষ বড়ুয়া, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, বয়স : ৫৭, তারিখ : ২৫.৯.০৯।

২. সাক্ষাৎকার : বনশ্রী মহাথের, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নোয়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ, চট্টগ্রাম, তারিখ : ০১. ১১.০৯।

৩. সাক্ষাৎকার : রতনশ্রী মহাথের, সদ্ধর্মজ্যোতিকা উপাধিপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকার : ০১.১১.০৯

৪. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত (কলিকাতা, ১৯৩৮), পৃ. ৩/৪

৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, পদাবলী পরিচয় (কলিকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ১৯২

৬. অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া, অধ্যাপক, মীরসরাই কলেজ, চট্টগ্রাম। তাছাড়া তিনি একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং সংস্কৃতিকর্মী।

৭. হরেকৃষ্ণ মখোপধ্যায়, পদাবলী পরিচয়, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪

৮. শান্তরক্ষিত স্থবির, ধর্মচক্র প্রর্বতন সূত্র (রেঙ্গুন, ১৯৬০), পৃ.০১

৯. হীরালাল তালুকদার, গ্রাম : সুখবিলাস, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, বয়সঃ ৭০, তারিখ : ২২.৮.২০০৯

১০. এ আসর বন্দনার গীতিকার শান্তরক্ষিত স্থবির। তিনি 'ধর্মচক্র প্রর্বতন সূত্র' নামক গ্রন্থে এ আসর বন্দনা লিপিবদ্ধসবার জ্ঞাতার্থে করেন।

১১. এ গীতিটির গীতিকার প্রিয়দর্শী মহাস্থবির। তিনি মার বিজয় নামক গ্রন্থে এটি রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তগত রাঙ্গুনীয়া উপজেলার নজরটিলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবীন চন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতার নাম ধনকুমারী বড়ুয়া।

১২. এ গানটি রচনা করেন জনপ্রিয় বৌদ্ধ সংগীত বিশারদ সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া। তাঁর 'মারবিজয়' নামক গ্রন্থে এ বন্দানা গীতিটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১৩. বুদ্ধ সন্ন্যাস মোহন চন্দ্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬),পৃ. ১৯

১৪. অনিল কান্তি বড়ুয়া, কীর্তন পদাবলী, অপ্রকাশিত, পৃ. ৩

১৫. উদ্ধৃত, Gojendragadker. K. V. Maharastra Saints and Their Teaching, Edited by Haridas Bhattacariya, the Cultural Heritage of India, Voll-iv. (Calcutta)

১৬. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২- ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছুটাকীর্তন

বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনে অন্যতম স্থান করে আছে এ ছুটা কীর্তন। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে এই ছুটাকীর্তনের আসর বসানো হয়। তবে অনুষ্ঠান ছাড়াও উৎসাহী বৌদ্ধগৃহে এরকম ছুটা কীর্তনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছুটাকীর্তন প্রসঙ্গে উল্লেখ হয়েছে ; পালা বর্হিভূত কীতনাঙ্গ গান। এ গান ছুটা এ অর্থে যে, তা কোন পালায় আবদ্ধ নয়। কোন পালার গান যদি পৃথকভাবে গাওয়া হয় তাহলে তাকেও ছুটাকীর্তন বলতে দেখা যায়[১]। ছুটাকীর্তন সাধারণত দীর্ঘ হয়।

১. আমার যাবার সময় হলো,
ভব খেলা সাঙ্গ হলো। (২-বার)
স্বর্গ হতে দেবতারা ডাকে আমায় আয়না ত্বরা।
রথ নিয়ে বসে আছে ইন্দ্ররাজা। (২-বার)
তারা ডাকে আমায় বারে বার আয়না ত্বরা করে,
সাধুবাদ দে--রে সবে ডাকে আমায় বারে বারে।
মৃদুস্বরে : আমি চলিলাম।
সাধুবাদ দে--রে তোরা আমি চলিলাম।
জয়ধ্বনি দে--রে তোরা আমি চলিলাম।

ঝুমুর : আমি চলিলাম চলিলাম। সাধুবাদ দে--রে তোরা আমি চলিলাম- ২ বার।[২]

২. এককাল দুইকাল আছে তিনকাল
তিনকালের পর আছে আরো পরকাল।
প্রথমকালের কথা তোমার মনে নেই,
খেলার সাথী নিয়ে তুমি দিয়েছ কাটাই।

প্রথমকালের পর আসিল যৌবন,

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমরার মতো তুমি করেছিলে গুঞ্জন।
তৃতীয়কাল যবে আসিল পরে
জরা-জীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্থ হলে যে ভবে।

এবার পরকালের চিন্তা তোমার আসিল মনে,
সবকিছু ত্যাগ করে বসিলে ধ্যানে।
যতকিছু করিয়াছ ঘুচিবার নয়,
যেমন কর্ম তেমন ফল ভুগবে নিশ্চয়।

কর্মফল ঘুচাবার কারো সাধ্য নাই,
এই কর্মফল ছায়ার মতো যায়।
তাই বলি সময় থাকতে ধর্মের পথে চলো,
পরকালে ধর্ম হবে তোমার পথের সম্বল[৩]।

৩. দুর্লভ মানবজন্ম জন্ম জন্ম সাধনার ফল
অবহেলায় দুর্লভ জন্ম হচ্ছে বিফল।
একবার চলে গেলে পাবে নাকো ফিরে,
জন্ম জন্ম বার বার সাধনা করে।

দান শীল ভাবন করো,
মানব জন্ম সফল করো।

মৃদু সুর : বৃথা কেন যাবেরে
এমন দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা কেন যাবেরে
এই সুন্দর মানব জন্ম বৃথা কেন যাবেরে
ঝুমুর : দুর্লভ মানব জন্ম জন্ম জন্ম সাধনার ফল- ২ বার।[৪]

৪. রাজা প্রজা ধনী গরীব এই দুনিয়ায় সব সমান
তবে কেন বাড়াবাড়ি কিসের এত মান।

Dhaka University Institutional Repository

চর্ম চোখে সব ছোট আর বড়,
কেবা ছোট কেবা বড় মনে মনে চিন্তা কর।

ধনীর যেমন স্থান হবে শ্মশান আর কবরে,
ধনীর পাশে গরীবকে যেতে কেবা রাখবে ধরে।
তুমি টাকা পয়সার গর্ব করে হইতেছে অহংকারী,
আমি দিন ভিখারী সেজে হইয়াছি ধর্মে অনুরাগী।

ধর্ম কর্ম নাহি করো বড়ই অভিমানী তোমার,
পরকালের সম্বল কিছুই না করো যোগাড়।
একবার চোখ বন্ধ করিয়া দেখো সবই অন্ধকার,
ধর্ম কর্ম সম্পাদনে কর পথ পরিস্কার।

ঝুমুর : রাজা প্রজা ধনী-গরীব এ দুনিয়ায় সব সমান তবে কেন বাড়াবাড়ি এত মান- ২ বার।

৫. মনে মনে করো সবে অনিত্য ভাবনা
মৃত ব্যাক্তির তরে করো সবে মঙ্গল কামনা।
ভাই বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী আর আত্মীয়-স্বজন,
ছেলে-মেয়ে মাতাপিতা আর পরিজন।

কান্নাকাটি হায় হুতাশা করে কিবা হয় ফল,
মৃত ব্যাক্তির সদ্গতি কমনায় সবাই বুদ্ধ বল।
কিবা দিবে কিবা নিবে দেখ ভাবিয়া,
কাষ্ঠখন্ডের মতো আছে পালঙ্কে শুইয়া।

টাকা আছে, পয়সা আছে,আছে অট্টালিকা,
ধন আছে জন আছে সব যাচ্ছে ফেলিয়া।
নিবার শক্তি নাই তার যত দিবে ভাই,
চোখ বন্ধ করিয়া চিরতরে নিতেছে বিদায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঝুমুর : ভ্রান্ত পথে আছে যারা পার করাতে বলে তারা[৭]।

৭. সকলি অসার মায়ার সংসার
অন্তিমের ধন কররে যোগাড়।
আত্মীয়-স্বজন আরো পরিজন

কেউতো নয় আপনার।
ভাবিয়া দেখ একবার।
কেন এত মত্ত ভোগ-বিলাসিতায়,
থাকবে না কোন কিছু হবে যখন বিদায়।
মৃদু সুর : অন্তিমের ধন কররে যোগাড়। ২ বার

দীর্ঘ ঝুমুর : সকলি অসার মায়ার সংসার অন্তিমের ধন কররে যোগাড়– ২বার[৮]।

৮. মায়ার সংসার ছাড়রে এবার
কিছুই নাই ভবে মায়াবিনে আর।
মায়ার কাননে সংসার কাননে
ভ্রমিতেছি বারবার।

মায়ার বন্ধন ছিন্ন কর মন
ছাড় ছাড় এই সংসার কানন।
ছাড়িতে বন্ধন মুক্ত কর মন,
ত্যজরে সংসার কানন।

শুদ্ধোধনের আদরের পুত্র
উদ্ধার করল জীবনের সূত্র
ত্যাজিল কানন সেই নন্দন,
ছাড়িল রাজ সিংহাসন।
মৃদু সুর : মায়ার বন্দন ছিন্ন কর মন ২–বার[৯]।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ ঝুনুর : মায়ার সংসার ছাড়রে এবার কিছুই নাই ভবে মায়া বিনে আর।

৯. যাহার নামেতে কাঁপে ত্রিভূবন
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে বলে বুদ্ধ বল।
যাহার নামেতে মহাব্রহ্মা এসে প্রণমি করে
যাহার নামেতে নাগরাজ এসে ফণা ধরে শিরোপরে।

যাহার নামেতে হস্তীরাজ এসে ছত্রধরে শিরোদেশে,
যাহার নামেতে কপিরাজ মধু দান করে।
বুদ্ধ এই পৃথিবীতে অনন্য মহান
তাইতো তিনি আজো মহীয়ান।
মৃদুসুর : বুদ্ধ বল বুদ্ধ বল-২বার[১০]।

দীর্ঘ সুর : যাহার নামেতে কাঁপে ত্রিভূবন স্বর্গ মর্ত্য, পাতালে - বুদ্ধ বল বুদ্ধ বল।

১০. আমার এই দেহের মাঝে কেবা রচে গৃহ বারে বারে,
আমি জন্মে জন্মে খুঁজে পাইনি তারে।
কেবা রচে কেবা ভাঙ্গে গৃহ বারে বারে,
খুঁজেছি অনেক পাইনি তারে।

এইবার তোমার পেয়েছি সন্ধান,
ভেঙ্গেছি সব গৃহ সরঞ্জাম।
অবিদ্যার জাল ছিন্ন করেছি,
সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেছি।

ধরাধামে আসিব না,
পুনঃজন্ম আর নেব না।
মর্ত্যলোকে আসিব না
দুঃখ কষ্ট আর পাব না।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ ঝুমুর : অবিদ্যার জাল ছিন্ন করেছি সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেছি–২বার[১১]।

১১. শুন শুন বৌদ্ধগণ শুন দিয়া
কি কারণে সংসারতে কর পরিভ্রমণ।
লোভ দ্বেষ মোহ হলতৃষ্ণার আগার,
অবিদ্যার কারণেতে ঘুর বার বার।

লোভ, দ্বেষ, মোহ এর জন্য তৃষ্ণাকে কর বারণ
এই তিন বন্ধ হলে তৃষ্ণা হয় নিবারণ,
অবিদ্যা ধ্বংস হলে পুনঃজন্ম নেবে ভবে,
সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করলে যাবে নির্বাণে।

ঝুমুর : অবিদ্যা ধ্বংস হলে পুনঃজন্ম নেবে ভবে সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করলে অবিদ্যা ধ্বংস হবে–২বার [১২]।

১২. কর্ম ছাড়া নাই কিছু ভবে
কর্ম করো কর্ম করো,
কর্মের যে তোরা ফল পাবি
কর্ম ছাড়া নাই কিছু ভবে।

কর্ম বিনে ধর্ম কভু
হয় নারে সাধন।
বৃক্ষ বিনে ফল কভু
হয় নারে ফলন।

মেঘ বিনে বৃষ্টি কভু
হয় নারে কখন
গুরু বিনে শিষ্যের কভ
হয় নারে যতন[১৩]।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. দিকে দিকে শুন তোমার জয়ধ্বনি
আনন্দেতে আমার নাই সীমানা
ওগো প্রভু থাকে যদি ভুল
করে দিও আমায় ক্ষমা

গাহে কতজনে তোমার জয়গান
শুনেও ভুরায় আমার মনপ্রাণ
আমিও গাহিব বলে এই শুভ লগনে
আমায় করো প্রভু তমি বলীয়ান।

আমিও গাহিতে চাই তোমার গুণগান
যদিও বা আমি হীন তুম যে মহান
ভুল যদি হয় লুটিয়ে পড়ি তোমার চরণেতে
রইল প্রভু মোর এই প্রার্থনা।

তুমি এই জগতে অনন্ত জ্ঞানী
গাহিনা আমি তোমার যতই জয়ধ্বনি
ত্রিভূবনে কেহ নাই তোমার গুণগাহি
শেষ কভূ করিতে পারে না[১৪]।

১৪. তুমি সুন্দর করুণার রাশি
পূর্ণ করিলে পারমী
তুমি প্রজ্ঞাবান তুমি মহাজ্ঞানী
তুমি নির্বানগামী।

হিংসায় পৃথিবী জ্বলেছে দহনে
ছিলেন কভু নন্দন কাননে

Dhaka University Institutional Repository

জরা ব্যাধি মৃত্যুর কারণে
কাদায়ে জগৎ প্রাণী
তুমি সুন্দর করুণার রাশি।

এই বিশ্ব তামাকে খোঁজে
তুমি যে জ্ঞান দাতা,
অবনত শিরে মাগি তাই ভিক্ষা
উদার করো জগতের পবিত্রতা।

মানুষেরে তরে নেমে এসেছিলে পথে
প্রচারিতে অমৃতময় রস তোমার বাণী
পূর্ণ করিলের পারমী[১৫]।

১৫. মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণ
শোধ হবে না কোন দিন
জন্ম জন্মের তরে করিলে সাধনা
দয়াবতি দয়া দেখালি মা।

আমায় ধরিয়া জঠরে কত কষ্ট করে
দশমাস দশদিন সে মা পেল যে যন্ত্রনা।
সন্তান ভূমিষ্ট হলে মা তারে কোলে তুলে নিলে
কষ্টের কথা মায়ের আর মনে থাকে না।

আবার একটি সন্তানের দায়,
কত মায়ের প্রাণ হারায়,
সে মাকে তোমরা সেবা করলে না।
আমার মায়ের কথা বলব কত
যদি বলি বছর শত

Dhaka University Institutional Repository

তবু না ফুরায় আমার মায়ের বর্ণনা[১৬]।

১৬. দিন যায় দিন যায়
এমন দিন আর পাবি না
কত দিন আসে আর
কত দিন ফিরে যায়রে।

বাল্যকালে বাল্য মেলা
যৌবনকালে তোর অউসের খেলা,
বৃদ্ধকালে বৃত্তি চিন্তা না করলি মন সাধনা,
তাইতো পাবিরে মন কঠিন যাতনা।

শোনরে মন তোমায় বলে,
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বলে,
যে মায়াতে ভুলে রইলি,
সেই মায়াতে আর ভুল না।

যখন গলায় কফ আসিবে,
ক্রমে উর্দ্ধশ্বাস হইবে,
ঘরের বাহির করে নিবে আর কেহ ছোবে না,
পাড়ার যত প্রতিবেশী শিহরেতে কাঁদবে বসে।

তখন তোমার প্রাণ প্রেয়সি,
মুখ পানে ফিরে চাবে না।
দিন যায় দিন যায়
এমন দিন আর পাবি না[১৭]।

১৭. ভগবান ভগবান জয় জয় ভগবান
পাপী-তাপী সবাই নাও রে

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের সেই অমৃত নাম।
ভগবান ভগবান জয় জয় ভগবান।

কৃপন ব্রাহ্মণ ছিল একপুরে
বিনা ঔষধে তার সন্তান গেল মরে।
মিষ্টকুন্ডলী ছিল তার নাম
বুদ্ধের নামে তার সন্তান পেল পরিত্রাণ।

আনন্দ আজি সেই নাম নিয়ে
ভব সিন্ধু গেল উদ্ধার হয়ে
আজি সেই নাম লও যদি মানবগণ
তবে,লভিবে পরম নির্বাণ[১৮]।

বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিকট এ ধরনের ছুটা কীর্তনের গুরুত্ব অপরিসীন। যেহেতু এ রকমের গীতগান কোনরকম পালায় আবদ্ধ হয় না সেহেত উৎসাহজন মাত্রই ছুটা কীর্তনের পদ রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এগুলো পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উৎসবে কিংবা বাড়িতে সান্ধ্যকালীন সময়ে পরিবেশন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ওতথ্য উৎস

১. করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ (ঢাকা :২০০৪), পৃ. ২০০

২. অনিল কান্তি বড়ুয়া, কীর্তন পদাবলী অপ্রকাশিত, পৃ. ১০

৩. ঐ, পৃ. ১৪

৪. ঐ, পৃ. ১৬

৫. ঐ, পৃ. ১৮

৬. ঐ, পৃ. ২০

৭. ঐ, পৃ. ১১

৮. ঐ, পৃ. ১২

৯. ঐ, পৃ. ১৫

১০. ঐ, পৃ. ১৩

১১. ঐ, পৃ. ২২

১২. শ্রীমান বড়ুয়া, (রাউজান) কর্তৃক সংগৃহীত।

১৩. কীর্তনীয়া তপন বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া) কর্তৃক সংগৃহীত।

১৪. মাদল বড়ুয়া, রাঙ্গুনীয়া কর্তক সংগৃহীত।

১৫. কীর্তনীয়া তপন বড়ুয়া (রাঙ্গুনীয়া) কর্তৃক সংগৃহীত।

১৬. কীর্তনীয়া মেম্বার রাজীব বড়ুয়া (সাতকানিয়া) কর্তৃক সংগৃহীত।

১৭. কীর্তনীয়া দীপক বড়ুয়া (রাউজান) কর্তৃক সংগৃহীত।

১৮. কীর্তনীয়া আনন্দ মোহন বড়ুয়া (লাহাগাড়া) কর্তৃক সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে স্বাধীন ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তারপর থেকে শুরু হয় এদেশের স্বাধীনভাবে পথ চলা। পয়ঁতাল্লিশ বছর ধরে মহামতি বুদ্ধ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ষোলটি জনপদই (কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদী, বংস, করু, পঞ্চাল, সূরসেন, মৎস, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ) ছিল তাঁর ধর্মমত প্রচারের অন্যতম স্থান। এখানে কোথাও বঙ্গের নাম নেই। বুদ্ধের পুত-পবিত্র দেহাস্থি আটজন রাজাকে ভাগ করে দেওয়া হয় ; সেখানেও কিন্তু বঙ্গের নাম পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে মগধও বঙ্গ একই রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, মগধের ভৌগোলিক সীমানা হচ্ছে পূর্বে চম্পা নদী, দক্ষিণে বৃন্দাবন পর্বতমালা, পশ্চিমে সোন নদী এবং উত্তরে গঙ্গা নদী। মগধের এরূপ ভৌগোলিক সীমানাই প্রমাণ করে যে, বুদ্ধের সময়কালে বঙ্গের কিছু অংশ মগধের অধীনে ছিল।

নানাধর্ম ও নানা আদিবাসীর বাসস্থান আমাদের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা রমনীয় ও মনোময় এ বাংলাদেশ। অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে বাঙালি বৌদ্ধরা এদেশে বসবাস করে আসছে। এ জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগ লোকই বসবাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলায়। তবে অল্পসংখ্যক এ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় বসবাস করে। জাতি হিসেবে এ সম্প্রদায় অতি বিনয়ী, সহজ-সরল সর্বোপরি শান্তিপ্রিয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড় আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ সমস্ত আন্দালনে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ছিল। তাছাড়া চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্যসেন-এর নের্তৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন এ জনগোষ্ঠী। এ রকম সহিংস এবং অহিংস উভয় আন্দোলনের সাথে এদেশের বাঙালি বৌদ্ধদের গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমন, বসতিস্থাপন সর্ম্পকে

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিক কোন রকম লিখিত দলিল কিংবা প্রমাণাদি নেই। তাই তাদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশদ এবং নিশ্চিতভাবে তেমন কিছু জানা যায় না।

কর্মবীর, পণ্ডিত, ও বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব সংঘরাজ সারমেধ (১৮০১–১৮৮২ খ্রি.) মহাথের-এর সংস্পর্শে এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনিই এ জনগোষ্ঠীর সদ্ধর্মের উন্নতি, প্রচার-প্রসার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হলে এদেশের কিছু সংখ্যক বাঙালি বৌদ্ধ ভারতে (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ) রয়ে যায়। আবার ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ব্রহ্মরাজ বগিড় ও ব্রিটিশপক্ষের য়্যাণ্ডন্যে বা যান্দাবুর সন্ধি স্থাপিত হয়। তখন আরাকানে এদেশের বাঙালি বৌদ্ধদেরও অবাধ যাতায়াত ছিল। এ সময়ের প্রচুর বৌদ্ধ সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এখনো সেখানে অসংখ্য বাঙালি বৌদ্ধ বসবাস করে

বাংলাদেশের এক অনুপম প্রাণসম্পদের নাম 'কীর্তন'। এ কীর্তন খুবই প্রসিদ্ধ লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। পরিবেশনা লোকশিল্পের বিশেষ পর্ব এটি। এদেশে বাঙালি বৌদ্ধদের নিজস্ব সংস্কৃতিরূপের যে উজ্জীবন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তারই বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে এ কীর্তনে। বুদ্ধের ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ এটি। তাই ধর্মীয় আবগের কারণেই সবার নিকট অতি সহজেই গ্রহণীয়। এমতাবস্থায় গ্রামের আবাল-বণিতা থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গরাও অধীর আগ্রহ সহকারে এ কীর্তন গান শ্রবণ করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কীর্তনের আসরে বসে থাকে। এ কীর্তনের আসরকে অবলম্বন করেই দু'টি দিক পরিলক্ষিত করা যায়। যেমন : ক. একতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং, খ. সামাজিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব-সংহতি উত্তরোত্তোর বৃদ্ধি ঘটে। উপরি-উল্লিখিত এ দু'টি দিক ছাড়াও এ কীর্তন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব অভিসংযোজন। কীর্তন এদেশের লোকসাংস্কৃতিক সংগীতের অন্যতম এবং এক অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধ ধারা। একসময় এ কীর্তন ছিল গ্রামীণকেন্দ্রিক। বর্তমানে শহরেও এ কীর্তনগান এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন পুজা, পার্বন, মৃতব্যক্তির আসর, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কঠিনচীবর দান, প্রবারণা পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা ইত্যাদিতে এ কীর্তন অনুষ্ঠিত হয় কিংবা কীর্তনের আয়োজন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা তথ্য-প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারের ফলে গ্রামের সমাজেও পরিবর্তন এসেছে। তারপরও এ কীর্তনের সর্বজনীন আবদনের কারণেই কীর্তনের আয়োজন করা হয়। তবে পৃষ্টপোষকতার অভাবে এ কীর্তন তেমন আর খুব জাঁক-জমকপূর্ণভাবে আগের মতো অনুষ্ঠিত হয় না। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ছুটা কীর্তন পরিবেশিমত হয় তা খুবই উন্নতমানের। জীবন জগতের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বগত দিক এখানে পরিবেশন করা হয়। এগুলোকে লোকশিক্ষার গান বলা যায়। তবে সংখ্যায় কম হলেও এখনো গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কীর্তন শোনার জন্য এ জনগোষ্ঠীর লোকজন সমবেত হয় ধর্মের অবিদিত বিষয় সর্ম্পকে জানার জন্য। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে এ কীর্তন ক্যাসেট আকারে বের হওয়ায় এটি আবার পরিবেশনা সংগীততেও অবস্থান করে নিয়েছে।

বৌদ্ধ কীর্তন ধর্মীয় গানের ধারা সন্দেহ নেই। তাই বলে এ কীর্তনকে অবহেলা করা যায় না কখনো। এ কীর্তনকে লোকশিক্ষা, লোককথা, নীতিকথার পরিচয়বাহী এক প্রকার উন্নতমানের সংগীত বললে কোনভাবেই ভুল হয় না। এগুলোর উপর ধর্মীয় গুরুত্বারোপত করা হয়েছে। এ বৌদ্ধ কীর্তনে কথার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করা হয়। আর আখরের সাহায্যে প্রকাশ পায় কীর্তনীয়ার উপস্থিত জ্ঞান, প্রতিভা, ও পাণ্ডিত্যতা। এগুলো এ কীর্তন ছাড়া আর কোন সংগীতেই প্রচলন নেই। এটিই মূলত এ কীর্তনের ব্যতিক্রম পরিবেশনা রীতি পদ্ধতি। পরিশেষে বলা যায়,বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতির অঙ্গনে বাঙালি বৌদ্ধ কীর্তনেরও প্রভাব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক বাংলা বই

অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্তিক পরিচয় (কলিকাতা, ১৯৭৯)

অতুল সুর, বাঙালি জীবনের নৃতাত্তিক রূপ (কলিকাতা, ১৯৯২)

অনিল কান্তি বড়ুয়া, কীর্তন পদাবলী (অপ্রকাশিত)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য (কলিকাতা, ১৯৭৩)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৯৭)

আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (ঢাকা, ১৯৮০)

আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা (ঢাকা, ১৯৮৮)

আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী (ঢাকা, ১৯৯৪)

আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্র (ঢাকা, ১৯৯৫)

এ. এস. এস. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশের জারীগান (ঢাকা, ১৯৮৬)

কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজমালা, ২য় লহর (ত্রিপুরা, ১৯২৭)

কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা (আগরতলা, ১৪০৫)

করুনাময় গোস্বামী, সংগীতকোষ (ঢাকা, ২০০৪)

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাংলা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৭৯)

দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৯৩)

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রাম, ২০০৭)

ধর্মাধার মহাস্থবির , বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (কলিকাতা, ১৯৯৫)

ধর্মরক্ষিত মহাথের কুমিল্লা জেলার ইতিহাস : ধর্ম ও ধ্যান- ধারণা ও বৌদ্ধধর্ম (কুমিল্লা)

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস (চট্টগ্রাম,১৯৯০)

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত, শ্রী পদামৃত, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা)

নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী , বাংলাগানের জগৎ (কলিকাতা, ১৯৯১)

নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস,আদি পর্ব (কলিকাতা, ১৪০২)

নীরু কুমার চাকমা, বুদ্ধ ধর্ম ও দর্শন (ঢাকা, ২০০৭)

পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস (ঢাকা, ২০০৪)

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, সদ্ধর্মমিত্র (চট্টগ্রাম, ১৯৮৭)

প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, সিবলী চরিত (চট্টগ্রাম, ১৩৬৮)

বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারতবর্ষ (কলিকাতা, ১৯৯৯)

বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত (কলিকাতা, ১৯৩৮)

বিরাজমোহন দেওয়ান, চাকমা জাতিরর ইতিহাস (রাঙ্গামাটি, ২০০৫)

ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া সম্পাদিত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম (কলকাতা, ২০০৭)

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, দাঠাবংস, অপ্রকাশিত

মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (কলিকাতা, ১৩২৩)

মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, বুদ্ধ সন্ন্যাস (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬)

মৃগাঙ্গ শেখর চক্রবর্তী, বাংলার কীর্তন গান (কলিকাতা, ১৯৯৮)

মৃনুল কান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা (ঢাকা, ১৯৯৩)

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৭৩)

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধ (কলিকাতা)

শান্তরক্ষিত স্থবির, ধর্মচক্রপ্রর্বতন(রেঙ্গুন, ১৯৬০)

সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি (কলিকাতা, ১৩১৬)

সুনীতি রহ্জন বড়ুয়া, বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য (চট্টগ্রাম, ১৯৯৬)

সাধনকমল চৌধুরী, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবির্বতন (কলিকাতা, ২০০২)

সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী (কলিকাতা, ১৯৯৫)

সুধীর রঞ্জন রায় ও অপর্ণা দেবী(কলিকাতা, ১৩৪৫)

সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, মার বিজয় (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, ১৯৬৬)

সন্তোষ বড়ুয়া, অজাতশত্রুর পিতৃ হত্যা (অপ্রকাশিত)

সন্তোষ বড়ুয়া, শ্যামাবতী (অপ্রকাশিত)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া (কলকাতা, ১৯৭০)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি (ককিাতা, ১৯৯৯)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, পদাবলী পরিচয় (কলিকাতা, ১৯৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

হিতেশরঞ্জন স্যানাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৮৯)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৪১)

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র্য (ঢাকা, ১৩৬৪)

অনোমা ২৪তম সংখ্যা (চট্টগ্রাম, ২০০৫)

দৈনিক আজাদী, ৩৫তম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, হাজার বছরের চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম, ১৯৯৫)

বোধি, কঠিনচীবর দান সংখ্যা, পটিয়া (চট্টগ্রাম, ২০০৩)

দৈনিক ঈশান ২৫/ ১২/ ১৯৯৭ (চট্টগ্রাম, ১৯৯৭)

দৈনিক ঈশান ২৬/ ১২/ ১৯৯৭ (চট্টগ্রাম, ১৯৯৭)

দৈনিক ঈশান ২৭/ ১২/ ১৯৯৭ (চট্টগ্রাম, ১৯৯৭)

দৈনিক ঈশান ২৮/ ১২/ ১৯৯৭ (চট্টগ্রাম, ১৯৯৭)

সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ

Dr. S. L Baruah, A Comprehensive History of Assam (New Delhi, 1985)

Dhrmaraksit Mahathera, The Singha Buddhist Community in Bangladesh (Comilla, 1999)

H. H. Riseley. The Trives and Castesof Bengal (Calcutta, 1981)

H.Tharanath, History of Buddhism in India ( )

Haridas Bhattacariya Edited, TheCultural Heritage of India, Voll-iv (Calcutta)

R.C Majumder, History of Bengal (Dhaka: 1943)

Edward Gati, History Assam (Calautta: 1995)

Dhaka University Institutional Repository

Sukomal Chaudhuri, Contemporary of Buddhism in Bangladesh (Calcutta: 1982)

W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal Voll-vi (London: 1876)

Internet

htt/ : www. Jstor.org/pss

htt/ : www. Seanjohnson kirtan.com.com/html

htt/ : www.boudlemanadaln.com/kirtan

htt/ : www.floweribglotous.com sec-level/kirtan.html